আহমদ শরীফ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতা

মো. রিজাউল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ : স্মারক বক্তৃতাসহ বেশকিছু বক্তৃতা আহমদ শরীফ দেশে-বিদেশে প্রদান করেছেন। বক্তৃতার বিষয় যেমন অভিনব তেমনি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য রয়েছে চিন্তার নানা উপাদান-অনুষঙ্গ। আহমদ শরীফের কেন্দ্রীয় ভাবনায় স্থান পেয়েছে মানুষ। এই মানুষ কীভাবে নির্বিঘ্ন-নির্দ্বন্দ্ব, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমস্বার্থে সহাবস্থান করবে সেটার উদ্দিষ্ট অন্বেষণই তাঁর সাহিত্যচর্চা তথা জীবনসাধনার মূলকথা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা তাঁর প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার আলোকে বিষয়টি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি।

স্মারক বক্তৃতার জগতে আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) প্রায় দুই যুগ সরব থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বারোটিরও বেশি বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এই বক্তৃতা সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে। বক্তব্য পরিস্ফুটনে স্মারক বক্তৃতাগুলোতে প্রাজ্ঞ চিন্তার গাঁথুনি পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তি আহমদ শরীফকে অতিক্রম করে 'স্রষ্টা' আহমদ শরীফ পরিচয় সেখানে বড় হয়ে উঠেছে, বক্তৃতার শিল্প নিপুণতার কারণে। এসব লিখিত বক্তৃতা দেশ-কালনিরপেক্ষ নয়। সমকালীন সমাজজীবনের অনেক ঘটনাপ্রবাহে তাড়িত হয়ে শিল্পিত প্রকাশে বক্তৃতাগুলো অসাধারণ। গতানুগতিক বিশ্লেষণ বক্তৃতায় সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে যে ছয়টি 'নজরুল অধ্যাপক' বক্তৃতা দিয়েছেন তা স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। এসব বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আহমদ শরীফের মানসপ্রবণতা স্ফটিক দানার মতো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিচে আমরা এসব বক্তৃতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

১. সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর স্মৃতি বক্তৃতা, ১৯৭৭

'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ'-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের আটজন লোকান্তরিত বিশিষ্ট ইতিহাসবিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তাঁদের নামানুসারে স্মৃতি বক্তৃতামালার আয়োজন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সময়োচিত পদক্ষেপ। এই আটটি স্মৃতি বক্তৃতার নাম ও প্রবন্ধকারের নাম উল্লেখ করা হল :

স্মৃতি বক্তৃতার নাম		**প্রবন্ধকারের নাম**
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	-	অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক
খ. যদুনাথ সরকার	-	অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
গ. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	-	অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক
ঘ. আব্দুল হালিম	-	ডক্টর মাহবুবুল করিম
ঙ. সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর	-	অধ্যাপক আহমদ শরীফ
চ. হাকিম হাবিবুর রহমান	-	অধ্যাপক এ.এফ. সালাহউদ্দীন আহমদ
ছ. কালিকারঞ্জন কানুন গো	-	অধ্যাপক আব্দুর রহিম
জ. নলিনী কান্ত ভট্টশালী	-	অধ্যাপক আবুল বাসার মোশাররফ হোসেন

৪ নভেম্বর ১৯৭৬ ঢাকা জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এ বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন কামরুদ্দীন আহমেদ এবং প্রথমে 'আব্দুল হালিম' স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর পরিচালক মাহবুবুল করিম। বক্তৃতার বিষয় 'ডায়ার্কি শাসনে বাংলাদেশ' (১৯২০-২৫)।

১০ জানুয়ারি ১৯৭৭ 'সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর স্মৃতি বক্তৃতা' উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। বিষয় 'মধ্যযুগের সাহিত্যে জাতি বৈরিতার স্বরূপ'। এই বক্তৃতাটির গোড়াপত্তন হয়েছিল 'জাতিবৈর ও বাংলা সাহিত্য' শিরোনামে ১৯৬৮ সালে ১৪ আগস্ট *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশের মাধ্যমে। পরে 'জাতিবৈর ও বাংলা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটি *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯) গ্রন্থে স্থান পায়। স্মারক বক্তৃতায় প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত রেখে কাঠামোগত কিছু পবিবর্তন করা হয়। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* ১ম খণ্ডে (১৯৭৮) 'মধ্যযুগের জাতিবৈর ও তার স্বরূপ' শিরোনামে উপর্যুক্ত স্মারক বক্তৃতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমাজজীবনকে আত্তীকরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সাহিত্য। সেই সাহিত্য এবং ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-তত্ত্ব-সত্য সহযোগে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের শেকড় কোথায় নিহিত রয়েছে এই বক্তৃতার বিশাল কলেবরে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণী মনোভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে তবে সে মত-মন্তব্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার সমাজজীবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সম্পর্কের এ এক অনবদ্য দলিল।

সমস্বার্থে ঐকমত্য ও সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা এবং সহাবস্থানের সদিচ্ছা আশা করা গেলেও এর অবর্তমানে জেগে ওঠে বিদ্বেষ বিষ, বাধে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আবার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের খবরও নগণ্য নয়। তাই "ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার আগ্রহ সোনার পাথর বাটি বানানোর মতোই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা, স্বধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মৌলশর্ত ও বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে অনুভবে ও আচরণে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। তাই একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর পরমতসহিষ্ণু হতে পারে কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধা রাখতে পারে না।" (আহমদ, ২০০০ : ৪৫) আচারনিষ্ঠ মানুষ বিধর্মে অনাস্থা ও বিধর্মী বিদ্বেষই স্বধর্মনিষ্ঠার উপযুক্ত কারণ হিসেবে মনে করে "এজন্য ধার্মিকেরা সাধারণত গোঁড়া, অনুদার এবং বিবেচনাবোধ ও বিবেকবুদ্ধিহীন" (আহমদ, ২০০০ : ৪৫) বলে তিনি উল্লেখ

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

করেছেন। শাসক প্রশাসক শিক্ষিত আস্তিক মানুষও জাতিবৈর থেকে নিরপেক্ষ নয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "...আস্তিক মানুষের বিধর্মী বিদ্বেষ, সাধারণ মানুষের দেশ-জাত-বর্ণ গোত্র দ্বেষণা এতোই স্বাভাবিক ব্যাপার যে এ নিয়ে কোনো দেশ-জাতি-বর্ণগোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা করা অবিবেচকের আচরণ মাত্র। বিদ্বানদের এ বিবেচনাও মানুষের অনেক দুঃখ যন্ত্রণার কারণ রয়েছে" (আহমদ, ২০০০ : ৪৬)। এ জন্য রাজা শশাঙ্কের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ বিদ্বেষের কারণ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে — "সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালকসহ যে ভৃত্য হত্যা করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।" (আহমদ, ২০০০ : ৪৭)। এভাবে আহমদ শরীফ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বৌদ্ধপীড়নের অনেক চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যের আলোকে উদ্ধৃত করেছেন।

বিদেশি-বিজাতি-বিধর্মী-তুর্কি মুঘল শাসনে এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে শাসিত হিন্দুর শাসক বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণে প্রবল হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধে (মুসলিম আক্রমণে) মন্দির ভাঙা এবং তদস্থলে মসজিদ নির্মাণের ফলে তুর্কি-মুঘলদের প্রতি অবজ্ঞা উপহাস বেড়ে যায়; এতে করে হিন্দুদের মনে অপমানের জ্বালা ও বিদ্বেষ-বিষ তীব্র আকার ধারণ করে — একথা আত্ম প্রতিষ্ঠিত সত্য। এজন্য মুসলিম কর্তৃক হিন্দু-পীড়নের চিত্র হিন্দু কবিরা সাড়ম্বরে এঁকেছেন। যেমন :

ক. যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে কবি হঠ
নানা মতে করে অনাচার
বামণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর। (আব্দুল ও অন্যান্য, ১৪০০ : ৫৫)

খ. ক্রোধে সে যবন দস্যু যবন লইয়া
খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া। (আহমদ, ২০০০ : ৪৯)

গ. যে হুসেন শাহ সর্ব উড়িষ্যার দেশে
দেব মূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে। (আহমদ, ২০০০ : ৫০)

আবার মুসলিম গুণকীর্তনও অনেক হিন্দু কবি করেছেন। যেমন :

সুলতান হোসেন শা নৃপতিতিলক।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি,
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত। (অমৃতলাল, ১৯৯৯ : ৪)

ব্রাহ্মণ্য সমাজে নীচজাতের ধর্ম-বর্ণের দুলে-বাগদি-চাড়াল-চণ্ডাল-মুচি প্রভৃতিদের ঘৃণ্য চোখে দেখা হতো। ধর্মান্তরিত মুসলিমও যে শাসকগোষ্ঠীর দয়া দাক্ষিণ্য সব সময় পেয়েছে বা সম-অধিকারে ভাগ বসাতে পেরেছে এমনটি নয়। সনাতন লোকধর্মের প্রতি নবদীক্ষিত বৈষ্ণবদের ছিল সীমাহীন অবজ্ঞা। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ প্রভাবে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে অনেকবার, ফলে মধ্যযুগে জাতিবৈর

কোনো না কোনোভাবে থেকেই গেছে। তবে একথাও সত্য যে, "দেশজ মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে হিন্দুর পীড়নের কথা নেই। তার কারণ দুটো : এক, তখনো গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত বা উপনিবিষ্ট মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। দুই, সার্বভৌম ক্ষমতা তুর্কি মুঘলের হাতে থাকলেও হিন্দু সামন্তরাই শাসন করত দেশ" (আহমদ, ২০০০ : ৫০)। শুধু তাই নয় "ঐ সংখ্যাগুরু হিন্দু বা ব্রাহ্মণরা যে শাসকতুর্কী বা যবনদের খুব ভয় করে চলত, তার প্রমাণও দুর্লভ।" (আহমদ, ২০০০ : ৫১)

কবি বিপ্রদাস ও বিজয় গুপ্ত হিন্দুর প্রতিশোধমূলক মুসলিম দলনচিত্র যেমন সগর্বে বর্ণনা করেছেন তেমন বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণও সদম্ভে মুসলিম দলনের বর্ণনা দিয়েছেন। এসব বিষয় সামনে রেখেই আহমদ শরীফ এগুলোকে "জাত্যভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈর জ্ঞাপক অতিশয়োক্তি" (আহমদ, ২০০০ : ৫১) বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কাল্পনিক পির-পাঁচালি রচনার যুগে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব ও পরিণামে আপস রফার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয় বলে আহমদ শরীফ মনে করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন — "তুর্কি মুঘল শাসনকালে মুসলিমরা ইংরেজ আমলের মতো জীবিকা ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি, তাই তাঁদের রচনায় হিন্দু-বিদ্বেষ মেলে না।" (আহমদ, ২০০০ : ৫২)

যেমন —

ক. আল্লাহর পরম মিত্র নবী মুহম্মদ
তাহান কালিমা পড়ি ভুঞ্জ রাজপদ। (আহমদ, ২০০০ : ৫২)

খ. নৃপতির করে ধরি তবে পয়গাম্বর
কালিমা পড়াইলা সুখে হরিষ অন্তর। (আহমদ, ২০০০ : ৫২)

বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি শাসক শ্রেণিকে হিন্দু প্রজাপীড়ক, শোষক, দুরাত্মা, গোঁয়ার, লোভী, পরস্বাপহারী, মূর্খধার্মিক বলে অভিহিত করলেও এটাই সর্বৈব সত্য নয়; আধুনিক শিক্ষিত বিদ্বানেরা এ কথাই স্বীকার করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এ মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন বিদ্বান-কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করে। তাহলে আহমদ শরীফের মতে, মধ্যযুগের জাতি বৈরের স্বরূপটা এ রকম :

> এসব দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র দ্বেষণা একটা সাধারণ মানবিক বৃত্তিরই প্রকাশ — এর মধ্যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনা খোঁজা নিরর্থক। এসব অভিব্যক্তি কেবল এ যুগে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বক্তব্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। (আহমদ, ২০০০ : ৫৭)

কারণ "গাঁয়ের নিরক্ষর নিঃস্ব নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা এ স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনা রক্ষা করা বা এর অনুশীলন করার গরজ কখনো তেমন অনুভব করেনি।" (আহমদ, ২০০০ : ৫৭) এসব সাধারণ মানুষ দুর্বোধ্য ও জটিল শাস্ত্রে আশ্বস্ত হতে না পেরে সহজ সরল পথের-মতের সন্ধান করেছে ঐহিক-পারত্রিক জীবনের স্বস্তি বাঞ্ছায়। লোকধর্ম তাদের কাছে হয়েছে প্রিয়। এজন্য বাউল সাধনা তাদের কাছে পেয়েছে ধর্মের মর্যাদা। এর মধ্যে তারা হিন্দু মুসলমানের সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থানের

মিলন ময়দান খুঁজে ফিরেছে। অন্যত্র দেখা যায় "...উচ্চ বিত্তের, বর্ণের ও শিক্ষার সুখী ও সম্পদশালী স্বস্থ মানুষই শাস্ত্র-সংস্কৃতি-সমাজের নামে বিভেদ-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য গৌরব ও স্বাধর্ম্যগর্ব অনুভব করে আনন্দিত কিংবা জিগীষু হতে চেয়েছে। এ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাত-সম্পদ চেতনার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। এর থেকে আস্তিক ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের নিষ্কৃতি নেই" (আহমদ, ২০০০ : ৫৭)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে সমস্বার্থে সমবণ্টনে সহাবস্থান করতে গেলে চাই সমাজতন্ত্র — এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে এই স্মারক বক্তৃতায়।

২. সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, ১৯৭৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ এপ্রিল ১৯৭৯ সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয় 'মানুষ ও তার পরিবেশ'। বক্তৃতাটি ১৯৮৫ সালে *কালের দর্পণে স্বদেশ* গ্রন্থে স্থান পায়। চারটি উপ-শিরোনামে বক্তৃতাটি লিখিত হয়েছে। যথা :

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ
শাস্ত্রীয় পরিবেশ ও মানুষ
আর্থিক নৈতিক সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ এবং
আধুনিক ও সাম্প্রতিককালে বাঙলার পরিবেশ ও মানুষ।

অত্যন্ত নিকটে থেকে সময় সমাজ পরিবেশ ও মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব উপলব্ধির এটি এক অভিনব প্রয়াস। মানবিক সমস্যার সকল প্রকার সমাধানের উপায় হিসেবে এবং স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ হিসেবে সুষ্ঠু-সুন্দর, সুস্থ-স্বস্থ পরিবেশের জন্য সমাজতন্ত্র আবশ্যিক বলে আহমদ শরীফ তাঁর এই বক্তৃতায় দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন। নিচে আমরা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব।

ক. 'প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ'-এর মধ্যে যে বিষয়টি বলতে চেয়েছেন তা হলো : আদিম যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণী ও মানুষ একইভাবে জীবন যাপন করলেও সময়ের ব্যবধানে আঙ্গিক উৎকর্ষের কারণে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে প্রাণি প্রজাতি থেকে অনেক অগ্রবর্তী হয়েছে :

> অতএব, কালিক বিবর্তনের ধারায় উদ্যোগী মানুষ বহু বহু ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করে প্রকৃতির আনুগত্য অস্বীকার করে কৃত্রিমভাবে জীবন প্রতিবেশ ও জীবিকা ক্ষেত্র তৈরী করেছে। সে আগুন তৈরী করে, জল ধরে রাখে, খাদ্য বানায়, জমি কর্ষণ করে, তরুলতা স্থানান্তরিত করে। আবার উষ্ণতা শৈত্য রোদ বৃষ্টি প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা যেমন করে, তেমনি এগুলোর প্রয়োজনানুরূপ পরিমিত ব্যবহার কৌশলও হয়েছে আয়ত্ত। (আহমদ, ১৯৮৫ : ৮২)

তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে বাঙালির ক্ষেত্রে — "উদ্যোগের অভাবে পৃথিবীর অন্য অনেক জাতির মতো ষড়ঋতুর প্রসাদ পেয়েও বাঙালিরা বলতে গেলে আবিষ্কার-উদ্ভাবন বিহীন। আধুনিক কালে প্রতীচ্য জগৎ তার প্রয়োজন মেটায়।" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৮২)

খ. 'শাস্ত্রীয় পরিবেশ ও মানুষ' অংশে লেখক বলতে চেয়েছেন, ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস থেকেই শাস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু এই শাস্ত্র, দেশান্তরে কালান্তরে তাৎপর্যহীন, এজন্য দেখা যায়, স্বকালে 'নবী অবতার' মানবত্রাতা, বিপ্লবী নেতা এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্র-বিপ্লব ও মুক্তিমন্ত্র হিসেবে দেশনা দিলেও কালান্তরে তা 'অপ্রযোজ্য উপযোগরিক্ত'। এজন্য লোভ প্রবল যেখানে সেখানে শাস্ত্রের প্রয়োজন শূন্য; দরকার সরকারি শাস্তি। আবার শাস্ত্র মানুষকে "কল্যাণকর জীবন চেতনায় ও কর্মে আচরণে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করে না। হিসেব করলে দেখা যাবে দ্রোহী মানুষই নির্বিশেষ মানবের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছে অধিক সংখ্যায়।...ভিন্ন ধর্মমতের ও শাস্ত্রের লোক আস্তিক মানুষের চির অবজ্ঞেয় ও শত্রুকল্প।" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৮৬)। এ কারণে ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় পরিবেশ 'মানুষকে পরমত অসহিষ্ণু করে তোলে।' আস্তিক শাস্ত্র প্রভাবিত বলে, "আস্তিক মানুষের সমাজে নির্বিশেষে মানুষের কোন মিলন-ময়দান তৈরী হয়নি।" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৮৭) আমাদের হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ মূলত এখানেই বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। এজন্য কায়মনোবাক্যে আস্থা রেখেছেন "দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানবের মিলন ময়দান তৈরী সম্ভব কেবল নাস্তিক্যে ও মার্ক্সীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে।" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৮৭)

গ. 'আর্থিক নৈতিক সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ' অংশে লেখক বলতে চেয়েছেন ইউরোপে নাস্তিক সংশয়বাদীরা শাস্ত্রের আগল ভেঙে সমাজ-জীবনে, অর্থনৈতিক-জীবনে অনেক পরিবর্তন আনলেও আবহমানকাল থেকে ভেতো বাঙালি অন্ন-আনন্দ বঞ্চিত হয়ে মহতের আকাঙ্ক্ষায় লালিত না হয়ে দেবানুগ্রহে থেকে ভোগবিমুখে বৃথাসান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছে। তাই এখানে সমাজ-মানসে জাদুটোনা, তুঁক-তাক, বাণ উচ্চারণ, শাস্ত্র দৈব প্রভাব এত প্রকট। আর অভাবের সাথে সখ্য আনতে ব্যর্থ হয়ে চৌর্যবৃত্তিকে অবহেলা করতে পারেনি। "কাজেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালীর আর্থিক নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অসুস্থ ও পঙ্গু। মন মানস ছিল আত্মপ্রত্যয়হীন। পরিবেশ ছিল স্বাধীন আত্মবিকাশের প্রতিকূল।...তাই সে কেবল লাটিমের মত ঘুরেছে — অগ্রসর হয়নি।" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৯০)

ঘ. 'আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালে বাঙলার পরিবেশ ও মানুষ'-অংশে লেখক বলতে চেয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলের প্রথম শতক সমাজের অযৌক্তিক ও অমানবিক নীতি নিয়মের নিগড়ে মানুষ আবদ্ধ। ব্রিটিশ আমলের শেষ শতকে দ্রুতগতিতে যন্ত্রের আবিষ্কার ও কৃৎকৌশলের আশীর্বাদে বর্ণে বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে মানবমুক্তির প্রত্যাশা জাগায়। ফলে "ব্যবহারিক জীবনের এসব উপকরণের সঙ্গে মানবজীবনের চিন্তা চেতনায় বিপ্লব ঘটালেন মুখ্যত ডারুইন, মার্ক্স ও ফ্রয়েড" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৯৪)। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাঙালিকে সামনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দুই হাজার বছরের হতদরিদ্র নির্ধন বাঙালি পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠা করল — স্বাধীনতা লাভ করল তবে মারা-কাড়া নীতি নৈতিকতাহীনতা তাকে পেয়ে বসল বলে গবেষক এ যুগ পরিবেশকে 'ভেজাল যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। সমস্বার্থে সহাবস্থানের তাগিদে সুস্থ-স্বস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে 'সাম্যতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কেবল এ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (আহমদ, ১৯৮৫ : ৯৬)

৩. বাংলা একাডেমি বক্তৃতামালা, ১৯৮৪

বাংলা একাডেমিতে ১৯৮৪ সালের ২০, ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা' বিষয়াবলম্বনে আহমদ শরীফ তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্যাপক পরিসরে উপস্থাপিত বক্তৃতাগুলো *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তনধারা* (১৯৮৭) গ্রন্থে স্থান পায়।

(ক) বক্তৃতার শুরুতে রয়েছে 'প্রস্তাবনা' ও 'পূর্বকথা'। প্রথম দিনের আলোচনা এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। শিরোনামোক্ত বক্তৃতাটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য 'প্রস্তাবনা'য় বিদেশি বিজাতি বিভাষী শাসক-শাসিতের প্রভাবে বাঙালির চিন্তা চেতনায় কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা? পড়ে থাকলে তার ধরনই বা কেমন ছিল? বাঙালি সংকর জাতি কিনা? বাঙালির সমাজ-মানসে আর্য প্রভাব ও আদিম সংস্কার কেমন ক্রিয়াশীল থেকেছে তার রূপ-স্বরূপ, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাধারণের জীবন-জীবিকা শাস্ত্র সংস্কৃতির ভিত্তি বিকাশ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তথ্যবহুল এসব আলোচনা নিরেট তথ্যের ভাবে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। মননশীল রচনাগুণ এবং চিন্তন বিশ্লেষণে অধ্যায়টি বেশ প্রাণবন্ত হয়েছে। তবে আলোচনায় তথ্যের অবতারণা থাকলেও এখানে তথ্যের কোন উৎস ব্যবহার করেননি। হয়ত 'প্রস্তাবনা'র কথা বিবেচনা করেই তিনি এ পথে অগ্রসর হননি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বাঙালি মানসে আদিম বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার প্রভাব বিষয়ে আহমদ শরীফের উক্তিটি বেশ লক্ষযোগ্য—

> যেহেতু জন্মসূত্রে ঘরোয়া পরিবেশে প্রাপ্ত মানুষের কোন বিশ্বাস সংস্কারেরই মৃত্যু বা বিলুপ্তি নেই, বাহুতে প্রথম-পাওয়া টিকার মতো চেতনার গভীরে তা অবিমোচ্য দাগ রেখে যায়, সেহেতু অন্তরে সুপ্তভাবে কিংবা ঈষৎ রূপান্তরে প্রজন্ম পরম্পরায় সে সব বিশ্বাস সংস্কারও থেকে যায়, এবং শীতকালে জরাগ্রস্ত মৃতপ্রায় সুপ্ত ওষধির মতো অনুকূল পবনে আবার প্রাণবন্ত হয়ে জেগে ওঠে। বাঙালী জীবনেও তা যুগে যুগে বার বার প্রকটিত হয়েছে বাঙালী সত্তার স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্যরূপে সাংখ্য, যোগ, ও তন্ত্র এবং লৌকিক দেবতা প্রভৃতি তার প্রমাণ। (আহমদ, ১৯৮৮ : ৫)

'পূর্বকথা'য় বাঙালির ধর্মমত বিশেষত দর্শন চিন্তা বিষয়ে তথ্যবহুল মৌলিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাঙালির দর্শন চেতনায় সাংখ্য, যোগ এবং তন্ত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়ে আসছে। এগুলো মূলত 'দেহবাদী বা দেহাত্মবাদী নাস্তিক

মত'। এসব অনার্য ধর্মমত কখনো স্থির হয়ে থেমে থাকেনি; নানা লোকধর্মে বিভক্ত হয়ে নানা সমাজে নানা বর্ণে জাতিতে চর্চিত হয়েছে। আবার জৈন-বৌদ্ধ, ইসলাম, হিন্দু, বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি ধর্ম সাধনার উৎপত্তি বিকাশ বিকৃতি বিলুপ্তি বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। বজ্রযান, সহজযান, বৈষ্ণব, সহজিয়া অথবা বাউল মত মূলত 'লোকায়ত লোকধর্ম'। এ সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্লেষণের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে উদ্ধৃতির প্রয়োগ করে রচনাকে তথ্যসমৃদ্ধ করে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

(খ) দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় শিরোনাম একই। বক্তৃতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এ পর্বের আলোচ্যসূচিতে স্থান দিয়েছেন : 'একেশ্বরবাদ ও ইসলামের প্রভাব', 'তুর্কী বিজয়কালে বাঙালীর ধর্ম', 'দেবতা ও দেবতামঙ্গল' এবং 'চৈতন্য বিপ্লব : বাঙলায় রেনেসাঁ' প্রভৃতি। প্রথম দিনের আলোচনায় বাঙালির আদিম ও প্রাচীন কালের ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি চিন্তা-চেতনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার মধ্যে রয়েছে মুসলমান আগমনের পর থেকে বাঙালির চিন্তায় যে সমৃদ্ধি ঘটেছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

হেজাজ সেনানায়ক মুহম্মদ বিন কাসিম ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে ইসলামের একত্ববাদের সাথে পরিচয় ঘটে এদেশি নির্যাতিত নিপীড়িত বর্ণে বিভক্ত প্রজা সাধারণের। তুর্কি বিজয়ের পর গণমানব নয় শুধু, শাহ-সামন্ত-উচ্চবিত্তের লোকেরাও ইসলামি সাম্যে-ভ্রাতৃত্বে ও মুসলিমের বলবীর্যে চরিত্রশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কেরল-মালাবারের শঙ্কর (৭৮৮-৮২০ খ্রি.)-ও ইসলামের ঋজুবাণীতে ও মুসলিম মনস্বিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি বটে তবে "স্বশাস্ত্র ঘেঁটে উপনিষদ থেকে বের করলেন একক উপাস্য বা স্রষ্টাতত্ত্ব।" (আহমদ, ১৯৮৭ : ৪৭) এজন্য শঙ্করকে একেশ্বরবাদী বা অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ও জ্ঞানমার্গী বলা হয়। তাঁর মায়াবাদ ও জ্ঞানবাদ বা ভক্তিবাদ দীর্ঘদিন থেকে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে নীরব বিপ্লব সাধন করেছে সমাজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। অথচ মানবতা সংযুক্ত থাকায় সংঘর্ষ রক্তপাত হয়নি বলে গবেষক মনে করেছেন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৪৯)

আবার তুর্কি বিজয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ফিরে দাঁড়াল স্বধর্ম রক্ষায় কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মে সাধারণের মোহমুক্তি ঘটায় তারা পুরাতন বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করে একেশ্বরবাদী হলো। তাই নিম্নবর্ণের অনেকের চিন্তায় দোলা লাগল নতুন দিগন্তের। এজন্য তারা মসজিদেও গেল না মন্দির-গির্জায়ও গেল না; খোলা আকাশের নিচে তারা মিলন মেলা তৈরি করল—

> মোকো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমে।
> না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মে ॥ (আহমদ, ১৯৮৭ : ৫৮)

এ নাস্তিক নিরীশ্বর বৌদ্ধমত বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে ঠাঁই নিল বাউল পন্থায়। বাউলেরা জগৎ ও জীবনের রহস্য খোঁজার জন্য, অধরাকে ধরার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল :

> জীবনের, জগতের ও স্রষ্টার এ রহস্য জিজ্ঞাসায় আত্মার এ আকুলতা অকূলে কূল পাওয়ার আকুলতার মতোই বৃথা জেনেও পিঁপড়ের সমুদ্র সাঁতারের আকাঙ্ক্ষার মতো ক্ষুদ্রমানুষের অসীমের সীমা সন্ধানের এ আগ্রহ ও আনন্দময় প্রয়াসে নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়। অধরাকে ধরার এ প্রত্যাশাই, এ আনন্দিত অনুভূতিই বাউলকে করেছে বিরাগী-পথিক। পথে নেমে, পথ চলে, পথের দিশা খুঁজে। পথ বাড়িয়ে, তৃপ্তির প্রত্যাশায় তারা অতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাটা জীবন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৬৫-৬৬)

তুর্কি বিজয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদে ইসলামের একত্ববাদের প্রভাব পড়ায় লৌকিক দেবতার সাথে মানুষ প্রতিবাদী হবার দীক্ষা পায় বলে আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন। এ জন্য চাঁদ সওদাগর দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে—

> আমি শিবের উপাসক, ওই একজন ছাড়া অন্য কাউকে — কোন নারী দেবতাকে পূজা করব না আমি। ('যেই হাতে পূজি আমি দেব শূল পাণি/সেই হাতে পূজিব আমি চেংমুড়ি কানি?') সর্বস্বান্ত হব, মরব, তবু মাথা নোয়াব না তার কাছে। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৭১)

এদিকে অজ্ঞ নিরক্ষর গেরস্থ ঘরের মেয়ে বেহুলা। বিয়ে কি জিনিস সে বুঝে না অথচ সন্ধ্যায় বধূ হয়ে ঢুকল বাসর ঘরে আর বিধবা হয়ে বের হলো ভোরে। কণ্ঠে তার দীপ্ত প্রতিবাদ—

> 'আমি মানি না, আমার জীবন যৌবন দাম্পত্য ব্যর্থ করে দেবার অধিকার কারুর নেই সৃষ্টিরও নেই স্রষ্টারও নেই। আমি এ মৃত্যু স্বীকার করিনে।' এ সদ্য বিধবার শোকোচ্ছ্বাস নয়, এ অবুঝ বালিকার জেদের কথাও নয়, এ এক সংকল্পে অটল দৃপ্তা নারীর বিশ্ব জগতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৭১)

তবুও দেবতারা ভক্ত বৎসল বলে 'বাম হস্তের পূজা' পেয়েও সন্তুষ্ট থেকেছে। মধ্যযুগে এমন দ্রোহ বিরল। এ মনুষ্যত্ব মহিমার সংগ্রামে বেহুলা হারেনি, হারেনি চাঁদও।

বাঙালির লৌকিক দেবতার প্রতি যে আকর্ষণ মুঘল আমলে বিকশিত হয়েছে সেখানে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মঙ্গল কাব্যের দেবতার স্থলে বাঙালি চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এ কারণে কালু, লখাই, মুরারীশীল, ভাঁড়ুদত্ত, খুল্লনা, লহনা, চাঁদ, বেহুলা, মদিনা, বড়খাঁ গাজী, নদের চাঁদ, মলুয়া, দুলাল, সখিনা প্রমুখ আমাদের চিরচেনা ঘরের মানুষ মাঠে ঘাটে দেখা মানুষ আমাদের আজন্ম কালের প্রতিবেশী আত্মার আত্মজ বন্ধু বা শত্রু বলে ড. আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৭২-৭৩)

মধ্যযুগের বাঙালির চিন্তা চেতনায় এক নতুন বিপ্লবের নায়ক হলেন চৈতন্যদেব। ইসলামি প্রভাবে বর্ণে বিভক্ত সমাজের ভাঙন রোধকল্পে স্মৃতির ও ন্যায়াদির দর্শনের

নতুনভাবে চাহিদানুগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নতুন তাৎপর্য ব্যঞ্জনা আরোপ করে গ্রহণ বর্জন সংশোধনের মাধ্যমে এবং মেল, কাপ, পটি, বন্ধনের নতুন নিয়মনীতি প্রবর্তনে ও প্রয়োগে বিদেশাগত ইসলামের অভিঘাত ঠেকানোর প্রয়াসী হন তিনি। অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতিরোধে বিমূঢ় হিন্দুর সুস্থধারা ফিরিয়ে আনতে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ কলম ধরেছেন। ঠিক এর পরপরই চৈতন্যদেবেব বাণী প্রমূর্তরূপ পেল সাহিত্যে। শুরু হল 'নরে নারায়ণ' ও 'জীবে ব্রহ্মদর্শন' প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মানুষই হল নারায়ণের প্রমূর্ত প্রতীক। তখন চাড়াল-চণ্ডালের বা দেব-দ্বিজের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে বাঙালি চিন্তায় যোগ করল নতুন মাত্রা। সুফি দর্শনের আলোকে মাশুক সম্পর্ক চৈতন্য প্রভাবে হলো রাধা-কৃষ্ণের রূপকে জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিভূ প্রতীক। নরসেবা ও মানবপ্রীতি হলো শ্রেষ্ঠধর্ম, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবমত এজন্য শুধু বাঙালির নয় এ মতাদর্শে লালিত গীতিকবিতা বৈশ্বিক সম্পদ হয়ে রয়েছে বলে আহমদ শরীফ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৮০)

(গ) পূর্বোক্ত মূল শিরোনামেই তৃতীয় দিনের (২২ সেপ্টেম্বর) বক্তৃতা সম্পন্ন করেছেন। এ পর্বে যে সব উপ-শিরোনাম নির্দেশ করে আলোচনা পরিব্যক্ত করেছেন তা হলো : 'বাঙলায় ইসলাম, মুসলিম ও সূফী', 'লৌকিক ইসলাম', 'শাস্ত্র চর্চা', 'শাস্ত্র চর্চার মূল প্রেরণা', 'সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক', 'বাঙালী মুসলিমের বহির্মুখিতার ফল', 'লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি', 'বাঙলার সূফীমত, 'মধ্যযুগের গোধূলীলগ্নে মুসলিমদের পতন-প্রতিরোধ প্রয়াস', 'গাঁথায় ঐহিক জীবন-চেতনা' এবং 'আধুনিক যুগের ঊষালগ্নে' প্রভৃতি। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্য সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে (মধ্যযুগের) সামনে রেখে বক্তৃতার এ অংশ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশে নয় শুধু, ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে মুখ্যত পির দরবেশ কর্তৃক। এঁরা ধর্ম সাধনায় অধ্যাত্মপন্থী, গুরুবাদী ও মরমি সাধক শরিয়তকে কখনো তারা ধর্ম সাধনার মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেননি। তাঁরা 'ব্যক্তিত্বে চরিত্রে আচরণের অনন্য লাবণ্যে ও ঔজ্জ্বল্যে' দুস্থ অসহায় এবং জাত-জন্ম-বর্ণ অস্পৃশ্যতার দোষে দুষ্ট জনগণের হৃদয় সহজে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন বলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। যন্ত্রবিরল সে যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছে বটে তবে পেশায় তারা নতুনত্ব আনতে পারেনি তাই "তাঁতী মুসলিম হয়ে হল জুলহা, হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-ব্যাধ নামান্তরে হল জেলে-নিকেরী, কাহার, কশাই, মুলুঙ্গী, রঙরেজ, মুজারী, কাগজী, মণ্ডল, বিশ্বাস সর্দার প্রভৃতি" (আহমদ, ১৯৮৭ : ৯২)। তাই আর্থিক, শৈক্ষিক, বৃত্তিক পেশাগত অভিন্নতায় নও মুসলিমরা পূর্ব পুরুষের বিশ্বাস-সংস্কার আচার-আচারণ পরিত্যাগ করল বটে কিন্তু সে জায়গা দখল করে নিল বৌদ্ধ হিন্দু বিশ্বাস সংস্কারের পুরাতন প্রবৃত্তি। এ অবস্থায় বাঙালি মুসলমানের সামনে যে ইসলাম স্থান পেল বিদ্বানেরা তার নাম দিয়েছেন 'লৌকিক ইসলাম'। আহমদ শরীফ প্রাসঙ্গিকভাবে এই 'লৌকিক ইসলাম' দ্বারা প্রভাবিত কবি ও

কাব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। পনেরো শতকে এদেশীয় কিছু সংখ্যক লোক যৎকিঞ্চিৎ আরবি জ্ঞান সম্বল করে ধর্মচর্চা করলেও বিভাষা হওয়ার কারণে শাস্ত্রবাণী উপলব্ধির উপায় ছিল না। ষোড়শ শতকে শাস্ত্রকথা বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইলেও অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে স্বচ্ছন্দ অনুবাদে অনুপ্রাণিত হতে পারেননি — অবশ্য ব্যতিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন দুই চার জন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ৯৬-৯৭)

পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় শাস্ত্রচর্চার প্রসার ওয়াহাবি ফরায়েজি-আন্দোলনে কিছুটা ব্যাপকতা লাভ করলেও তা এখনো সফলতা লাভ করতে পারেনি অজ্ঞ-অশিক্ষিত দরিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে। অবশ্য মুসলিম সমাজ মধ্যযুগে শাস্ত্রচেতনা অনুভব করেছে পুণ্যের জন্য নয় "নিতান্তই স্বধর্ম প্রীতিবশে। এরও মূলে রয়েছে আত্মমর্যাদা বোধ এবং স্ব-গোষ্ঠীর সম্মান চেতনা।" (আহমদ, ১৯৮৭ : ৯৯)

হিন্দু সমাজ তুর্কি আমলে লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠারোধে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র রক্ষায় কায়স্থ-বৈদ্যরা মুসলমানের ছত্রছায়ায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবতের অনুবাদ করেছেন। ষোল শতকে নিজ ধর্মের গৌরবে গর্বী হিন্দু-মুসলমান পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে বটে তবে কখনো গাঁ-গঞ্জের হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বে-মিলনে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের চিত্র দুর্লভ নয় বলে এই মর্মে ব্যাপক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১০১)

অস্বীকার করার উপায় নেই যে,

> বাঙালী মুসলিম ইসলামে ও আরব-ইরানে ছিল সমর্পিতচিত্ত, যদিও তার জন্ম-জীবন-মৃত্যু ছিল বাঙলার মাটির ও বাঙলার আবহাওয়ার দান।...তবু সে স্বদেশ-স্বজাতি স্বসংস্কৃতি খুঁজেছে মরুভূ আরবে, উত্তর আফ্রিকায়, ইরাকে, ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। হতে চেয়েছে কোরাইশী, হাসেমী, সিদ্দিকী, উসমানী, আলাভী, ফাতেমি, নিশাপুরী, মদনী, বলখী, বোখারী, গজনবী। ফলে স্বদেশের মাটিতে ছিল না তার মনের শিকড়, স্বদেশের মাটি ও মানুষ ছিল না তার জিজ্ঞাসার ও মননের বিষয়। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১০২)

শরিয়তি ইসলাম যেমন বাংলায় মধ্যযুগে চর্চা হয়নি অনুরূপভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে যে সুফি মতবাদ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতেও রয়েছে 'সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, নির্বাণবাদ, মোক্ষবাদ, জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেমবাদ ও সর্বাত্মক লীলাবাদ লোক ঐতিহ্য'-এর স্থানীয় প্রভাব বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (আহমদ, ১৯৮৭ : ১০৪)। প্রাসঙ্গিকভাবে সুফির লক্ষ্য, সুফি সাধনার ধরন বৈশিষ্ট্য, সুফির উন্মেষ বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি (১৫৩৮-৩৯, হুমায়ুন-শের শাহের বাংলা বিজয়) থেকে আঠারো শতকের (১৭০৭ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু) প্রথম পাদে দেশের রাজনীতি নানা উত্থান পতনের বাতাবরণে সমৃদ্ধ। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবস্থা খুবই করুণ ছিল : বাঁচার ও বাঁচানোর যৌথ গরজে মতের আপসমুখী, মনের মিলনমুখী এবং

উপাস্যের বা ইষ্টদেবতার ক্ষেত্রে সমন্বয়মুখী সত্তার প্রয়োজন সে সময় অনুভূত হয়। বাঙালির সে প্রয়োজন মিটিয়েছে 'সত্য' :

> যেন শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কার-বিশ্বাস-সংস্কার সব মিথ্যা ও বৃথা, অনিবার্য-অনাদি 'সত্য' ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই, ওই অব্যয় অবিনশ্বর সত্যই কেবল ধ্রুব। এবং সত্য কাউকে কখনো করে না বঞ্চনা, তাই সত্যই কেবল মানুষকে দুঃখ বিপদ-যন্ত্রণার দাবিদার থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করতে সমর্থ। হিন্দুরা বহু দেবতার পূজারী, তাই 'সত্য'কে তারা সহজেই নারায়ণ রূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু একেশ্বরবাদী মুসলিম কেবল কিরামতির ফকির পীর রূপেই তার আনুগত্য স্বীকার করেছে। তাহলেও সত্যের গুণ-মান-মাহাত্ম্য রয়েছে অভিন্ন।...একারণেই পীর নারায়ণ সত্যের ভোগ হয়েছে শিরনী, পূজায় আবাহনে হিন্দু-মুসলিম একত্রে সাগ্রহে সভক্তি আস্বাদন করেছে নিবেদিত শিরনী-প্রসাদ-তবারক হিসেবে জাত-জন্মের-ছোঁয়াছুয়ির প্রশ্ন তোলেনি কোন পক্ষই, কেবল তা নয়, শিরনী বেটে খেয়ে তালুতে হাত মুছেছে বামুন-পুরুত-মোল্লা-সত্যের অসন্তুষ্টি কিংবা অবমাননার ভয়ে হাত ধুয়ে ফেলেনি শিরনীর লেশ। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১১৫-১১৬)

এদিন ভাতে কাপড়ে স্বস্তিতে বাঁচার গরজে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত বিপন্ন দীন দুঃখী হিন্দু-মুসলমান বাঙালি 'সত্য' নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল। সেদিন ভিন্ন অবয়বের শাস্ত্রের ও মানব সত্যের অভিন্নতা অবলীলায় স্বীকৃত হয়েছিল :

> মক্কার রহিম আমি অযোধ্যার রাম
> ফকির হয়ে ভ্রমি আমি তোমার কারণ
> কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১১৬)

সত্য নারায়ণের পাঁচালিতেই স্বীকার করা হয়েছে যে, 'বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়'। এ সময়ে সুপ্রাচীন কালের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সবকিছু তুচ্ছ জেনে দু-মুঠো খেয়ে পরে বাঁচার তাগিদে আপাত প্রয়োজনে গভীর তত্ত্ব ও গূঢ় তাৎপর্যহীন দেবতা বানিয়ে (সত্যের চেলা যারা-ষষ্ঠী, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি) পূজা করাতে বোঝা যায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় কত দুস্থ কত হতদরিদ্র, বিপন্ন ছিল। আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়ের (১৭১২-৬০) দু-দুটো কাব্যে প্রতিফলিত সত্য নারায়ণের স্তব-স্তুতি সে সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এজন্য তাঁর রচনায় পরিব্যক্ত মন-মনন-রুচি-বুদ্ধি-আদর্শের বিকৃতির ও অপকর্মের কারণ শনাক্তকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও দুর্দিন ঘনীভূত হয় ১৭৫৭ সালের পর, বিশেষত ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ান প্রাপ্তির পর। দেশ-কাল-যুক্তিবুদ্ধি চেতনাহীন মুসলমান উনিশ-বিশ শতকে ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল হিন্দু-ব্রিটিশকে দোষ দিল কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োজন সেটা গ্রহণ করল না — প্রাচ্য-প্রাচীন বিশ্বাসে পড়েই থাকল। মুসলমানদের মধ্যে যারা ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হলো তারা মুসলমান বটে তবে উর্দুভাষী—

বাঙালি মুসলমান নয়। ফলে অর্থ-মনন উভয় দৈন্যে বাঙালি মুসলমানের কাটল দীর্ঘ সময় — আধিমুক্তির পথ তৈরি হলো না।

আহমদ শরীফ তিনটি বক্তৃতায় বাঙালির শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে মন-মনন-মনস্বিতার ও কর্ম-আচরণের বিবিধ ও বিচিত্র ধারাকে চমৎকারভাবে স্বীয় প্রাজ্ঞ প্রতিভার ছোঁয়ায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তবে এ ধরনের আলোচনাই শেষ কথা নয়, এতে কেবল জিজ্ঞাসা কৌতূহল বাড়ে, কখনও চিন্তা তর্ককে জট পাকিয়ে জটিল থেকে জটিলতর করে। সেক্ষেত্রে আহমদ শরীফের বক্তব্য-মতামত হয়ত বিতর্কের সূচনা করলেও কোনোভাবেই তা উপেক্ষা করা চলে না।

৪. উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা বক্তৃতামালা, ১৯৮৫

৬ আগস্ট ১৯৮৫ উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে আহমদ শরীফ প্রদত্ত বক্তৃতামালার শিরোনাম 'মধ্যযুগের বাঙলায় জীবন ও জগৎ জিজ্ঞাসার রূপ স্বরূপ'। বক্তৃতাটি *বাঙালির চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা* গ্রন্থের ১২৭-১৫৪ পাতায় স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালির সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর গবেষকের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির মন-মনন-মনীষাকে জানার তথা জীবন ও জগৎ ভাবনার বিষয়টিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্কন করার ক্ষেত্রে তিনি পারঙ্গম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন :

> মধ্যযুগের বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষায় জীবনতত্ত্বের ও জগৎ-চেতনার যে কালিক স্থানিক, গোত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও শাস্ত্রিক অভিব্যক্তি ঘটেছে, গোড়ায় ছিল তার দুটো রূপ : একটি ঐহিক ও দৈহিক এবং অপরটি ছিল পার্থিব জীবনসম্পৃক্ত হলেও আধ্যাত্মিক এবং পারত্রিক। ...
>
> মর্ত্য জীবনের বঞ্চনা-নিরাশা তাকে দেবাশ্রিত ও অন্তর্মুখী করেছে বাস্তবে ব্যর্থতা কল্প জগতের আশ্বাসকামী করেছে তাকে। তাই পার্থিব জীবনের নিরাপত্তার ও সুখ-শান্তি আনন্দ আরামের জন্যে বাঙালীর দেবতা সৃষ্টিতে ও দেবতা পূজাতে কোন মনন ছিল না, ছিল মতলব মাত্র। ঐহিক জীবনের অরি ও মিত্র শক্তি প্রতীক এসব দেবতার সঙ্গে মানুষের পাপ-পুণ্য সম্পৃক্ত স্বর্গ-নরক প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই, অন্য দেশে অন্য মানুষ এ ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, তুক-তাক, বাণ-উচ্চাটনে ও দারু-টোনা, আশ্রিত হয়। এটাও বাঙালীর ঐহিক জীবন প্রবণতার প্রমাণ। এ ভোগ-সুখ লোভী কর্মকুণ্ঠ বাঙালীর কৃপা, -করুণায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে বাঁচার ঘৃণ্য আগ্রহেরও সাক্ষ্য। তোয়াজে-তোষামোদে অরি দৈব শক্তিকে বশ করার আর মিত্র শক্তিকে বশে রাখার প্রয়াস বাঙালীর পৌরুষের উদ্যমের, আত্মপ্রত্যয়ের সাহসের সদিচ্ছার ও আত্মসম্মান বোধের স্বল্পতারই প্রমাণ। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৩১-১৩২)

বাঙালির জগৎ জন্ম ও জীবন সম্বন্ধীয় তত্ত্বালোচনায় দৈহিক ঐহিক ভাবনা এসেছে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি নাস্তিক নিরীশ্বর চেতনা থেকে। আর পারত্রিক ভাবনা এসেছ শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব, মুসলিমের দেশজ সুফিতত্ত্ব এবং চৈতন্যের প্রেম বা ভক্তিবাদ

থেকে। তবে এ কথাও ঠিক 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় মৈথুনতত্ত্বচিন্তার, সাংখ্যের, যোগের ও তন্ত্রের ঐহিকতার এবং দৈহিক জীবন-চেতনার গুরুত্ব ছিল অশেষ, ঐতিহ্য ছিল গভীর ও ব্যাপক। তাই নব্যযুগের সাধারণ হিন্দু বাঙালির মনে-মননে, শাস্ত্রে-সমাজে-আচারে সংস্কারে ও তাত্ত্বিক শিক্ষা সংস্কৃতিতে ঐহিকতা পেয়েছিল বিশেষ প্রাধান্য (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৩৩-১৩৪)। এজন্য তন্ত্রের সারকথা 'যা আছে ভাণ্ডে (দেহে) তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' এ তত্ত্ব বাঙালিকে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে। বিশ্বাস স্থাপন করেছে "ভাণ্ডের তথা দেহের সন্ধান নাও, কায়া সাধনে দেহের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক হলেই অজরামরবৎ সর্ব শক্তির অধিকারী হয়ে জীবনকে ইচ্ছাসুখের ও ইচ্ছা মৃত্যুর অধীন করা সম্ভব হয়" (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৩৩)। এ কারণে বাঙালি কায়া-বামাচার-বজ্রশূন্য-নির্বাণ-সহজিয়া-সুফি-বৈষ্ণব-বাউল প্রভৃতি সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এগুলো মূলত জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-মুসলিম প্রভাবিত বিশ্বাস-ধর্ম-আচার সংস্কৃতির লোকায়তিক প্রভাব। এসব সাধন পন্থার জন্য ব্যবহার করেছে হেঁয়ালি সান্ধ্য ভাষা। দেহের রূপক নাম দিয়েছে মন-পাবনের নাও, যেখানে 'মন হয় পবন, পবন হয় সাঞি।' দেহের অঙ্গ ও অন্তর প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—

> খাকের খুটি নৌকা টাটী আবের গড়া
> পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া। (যাকারিয়া, ১৯৭৪ : ৮০)

মুসলিম সুফির চিন্তায় দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে এ ভাষায়—

> বীজ হতে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল
> একে হয় তিন জান তিনে এক হয়
> বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহো ভিন্ন নহে। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৫১)

তবু—

> ঢেউ মেলে কভু সাগর না মরয়।
> তেমমত জানিয়া বান্দা আর খোদায়। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৫১)

চৈতন্য দেবের অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা পরমাত্মারূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে আত্মার চিরস্থিতি লাভের জন্যই বিরহ বেদনার প্রকাশ ঘটেছে —

> রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
> যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৪৭)

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চৈতন্য প্রবর্তিত এ অদ্বৈতবাদমূলক প্রেমধর্মে ইসলামের ও সুফি মতের প্রভাব ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আবার "বেদান্ত প্রভাবে সুফীরা যেমন অদ্বৈতবাদী, তেমনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অঙ্গীকার করেও বৈষ্ণবরা ইসলামের প্রভাবে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রায় সূর্যের ও সূর্যালোকের বা পানির ও ঢেউয়ের মতো অবিচ্ছিন্ন বটে, ভিন্নরূপে আলাদাও বটে" (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৪৬)। এভাবে বাঙালির চিন্তায় দৈহিক-ঐহিক, ইহ-পারত্রিক অরি-মিত্র স্রষ্টা-সৃষ্টি, সম্পর্কে যে ধারণা তা শিক্ষাগত, দৈশিক, কালিক প্রভাবে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হয়ে

পরিবর্তনের পথে সদা নিরত রয়েছে। আমাদের আলোচ্য বক্তৃতামালায় গবেষক সেটা পরিব্যক্ত করেছেন।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম বক্তৃতামালা, ১৯৮৫ ও ১৯৮৬

আহমদ শরীফ ১৯৮৩ সালে ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিক অবসর নেওয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'নজরুল অধ্যাপক' পদে দুই বছরের জন্য (১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬) নিয়োগ লাভ করেন। তবে এ পদে সমাসীন হলেও তাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করতে হয়নি। তিনি সেখানে গিয়ে দুই বছরে মোট ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এই ছয়টি বক্তৃতার সংকলন হলো *একালে নজরুল* গ্রন্থ (১৯৯০)। নজরুলকে নিরপেক্ষ নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে *একালে নজরুল*-এর বিকল্প নেই। অবশ্য কিছু বিষয়ে গতানুগতিক বক্তব্য সেখানে থাকলেও রচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে স্বভাবসুলভ বিশেষ স্বকীয়তা। ১৯৮৫ সালে তিনি মোট তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন :

(ক) ১২ ফেব্রুয়ারি 'কাজী নজরুল ইসলাম : কবির মনোজগৎ'
(খ) ১৩ ফেব্রুয়ারি 'পাঠক সমালোচকের চোখে নজরুল সাহিত্য'
(গ) ১৩ ফেব্রুয়ারি 'কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ'।

তিনটি বক্তৃতায়ই সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান দিলওয়ার হোসেন। এরপর আহমদ শরীফ ১৯৮৬ সালে আরও তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন :

(ক) ২ মার্চ 'নজরুলের কবিস্বভাব : শক্তিপূজা'
(খ) ৩ মার্চ 'নজরুলের কবিস্বভাব : প্রেম তৃষ্ণা' এবং
(গ) ৪ মার্চ 'নজরুলের কবিভাষা : পুরাণ ও প্রকৃতি'।

সকল বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন দিলওয়ার হোসেন, সভাপতি বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণীত হওয়ায় এবং প্রবন্ধের কলেবরের কথা বিবেচনা করে এ সম্বন্ধে আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকলাম। তবে ছয়টি স্মারক বক্তৃতার সারকথা হলো : নজরুল যুগের কবি, হুজুগের কবি, সমকালের কবি, অতৃপ্ত হৃদয়ের কবি, প্রেমের কবি, স্বাধিকার আন্দোলন ও গণ-মানবের কবি। চিন্তা-চেতনায় অসংলগ্নতার কবি, শিল্প সাহিত্য প্রেম বিষয়ে স্থূল চেতনার কবি। তার পরেও তিনি বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ বলে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন।

৬. বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়ন বক্তৃতা, ১৯৮৬

বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়ন বক্তৃতা ১৯৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তন কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষের তৃতীয় তলায় ফয়েজ আহমদ-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় : 'বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারা'। এ বক্তৃতাটিও *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যারা প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় ঋদ্ধ থেকে কাব্য-সাহিত্য রচনা করেছেন অথবা প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং তাদের প্রগতি চেতনার প্রেক্ষণ বিন্দুর স্বরূপ কেমন ছিল এ বিষয়ে অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা এটি। বক্তৃতায় প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করেছেন প্রগতি কী, কোন যুগের প্রগতি চেতনা কেমন ছিল, তার স্বরূপই বা কেমন ছিল প্রগতির সংজ্ঞার্থ স্বরূপের মাপকাঠিতে কাদের প্রগতিবাদী বলা যায়, কেন যায় এসব প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব এ বক্তৃতায় আমরা খুঁজে পাব।

> জীবনাচারের বিকাশমানতাই প্রগতি। প্রগতির পথ এজন্য 'অশেষ, গতিও নিরন্তর অনিঃশেষ।' সুতরাং মননে ও জীবনাচারে তথা ভাব-চিন্তা, কর্ম আচরণে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে নিত্যগতিশীলতা, নিত্য-সৃজনশীলতা ও নিত্য বিকাশমানতাই প্রগতি। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৬০)

মেরামত বা সংস্কার প্রবণতা নয় নতুন কিছু নির্মাণ-উদ্ভাবন প্রবণতাই হচ্ছে প্রগতিশলীতা, 'জীবনে সমাজে শাস্ত্রে ও রাষ্ট্রে মানুষের কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে বিঘ্ন ও সমস্যা এড়িয়ে সমাজস্বাস্থ্য রক্ষা এবং জীবিকার নিশ্চয়তা ও বিস্তার-বিকাশ সাধন লক্ষ্যে পুরনো চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি প্রয়োজন মতো পরিহারে ও নতুন নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি নির্মাণে আগ্রহী, দ্রোহী ও জিজ্ঞাসু মানুষই প্রগতিশীল' বলে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৬০)। তিনি সেন আমল থেকে ভাষা সাহিত্য সম্পৃক্ত 'প্রগতি' বিষয়ক আলোচনা এ বক্তৃতায় স্থান দিয়েছেন। যে ভাষা ও সাহিত্য সমাজ জীবনের চিন্তা-চেতনাকে আত্মস্থ করে বেড়ে উঠেছে। শঙ্কর থেকে রাজা রামমোহন রায় পর্যন্ত দেশে দ্রোহ অনেক হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের নামে অথবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় সাধিত হয়েছে অনেক বিপ্লব। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টাকে প্রগতিশীলতা বলে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ আস্তিকেরা যে বিপ্লব দ্রোহ করে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন, করছেন সেটাকে গবেষক লাটিমের ঘূর্ণনের সাথে তুলনা করেছেন; নিজ অক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে কিন্তু এগোতে পারে না।

ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারের সমান্তরালে চৈতন্যদেব সুফি সাধনার ধারণাকে আত্মস্থ করে ন্যায়-স্মৃতি শাস্ত্র রোমন্থন করে নতুন আঙ্গিকে প্রচার করলেন ভক্তিবাদ — প্রেমধর্ম। শূদ্র তাতে পেল মানবের অধিকার। অস্পৃশ্যতাদুষ্ট বর্ণ বিদ্বিষ্ট দেশে 'নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম' প্রত্যক্ষ করে চৈতন্য দেব ঘোষণা করলেন, 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।' এজন্য চৈতন্যদেব "দ্রোহী, জিজ্ঞাসু, মানব সাম্যে আস্থাবান প্রগতিপন্থী। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৭৫)। সতেরো আঠারো শতকে মঘ-হার্মাদের লুণ্ঠন-নির্যাতনে এবং মোঘল শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে জনসাধারণ প্রচলিত দেব-ধর্মে আস্থা হারিয়ে ঐহিক জীবনের কল্যাণ নিয়ন্তা হিসেবে আবিষ্কার করে পির নারায়ণ 'সত্য'কে।

> এক হিসেবে 'সত্য' পূজারী ও দ্রোহী। জিজ্ঞাসু এবং প্রগতি পন্থী। কেননা অজ্ঞ হয়েও এরা কোরআন-পুরাণোক্ত জগৎপিতার প্রতি ভয়-ভরসা, আস্থা হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে প্রমূর্ত সত্য নির্ভর হয়ে বাঁচার ঝুঁকি নিয়েছিল, এ যুগে শিক্ষিত লোকের মার্ক্সবাদ অঙ্গীকার করা আর ওই মধ্যযুগে গাঁ-গঞ্জের নিঃস্ব মানুষের 'সত্য বরণ করা কালের ধারায় প্রায় অভিন্ন দ্রোহের ও মানস মুক্তির পরিচায়ক। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৭৮)

তুর্কি-বিজয়ের পরে চণ্ডী-মনসার ধামালি-পাঁচালিতে কাহিনির তাৎপর্যগত পরিবর্তন লক্ষণীয় বিধায় মুসলমানদের একত্ববাদের দীক্ষা আমরা চাঁদ সওদাগরের মধ্যে পেয়েছিলাম। এক শিব ব্যতীত কাউকে সে পূজা দিতে চায়নি। এটাও তার প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয়। তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে এ এক বিরল ঘটনা (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৭৮)। আবার দ্রোহ মাত্রই প্রগতিশীল নয় বলেই মজনুশাহ-ভবানী পাঠক প্রমুখরা কেন প্রগতিপন্থি নয় তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন আহমদ শরীফ। অনুরূপভাবে আঠারো শতকে মুসলিম ধর্মীয় নেতা বিশেষত ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের নেতাদের এবং আধুনিক কালের মওদুদিপন্থিদের প্রগতিবাদী বলতে পারেননি 'বন্ধ্যা চেতনার অতীতমুখী রক্ষণলীল মানুষ' বলে (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৭৯)।

আহমদ শরীফ এ বক্তৃতায় প্রগতিবিষয়ক আলোচনা মধ্যযুগের প্রান্ত সীমায় আবদ্ধ রাখেননি। আধুনিক যুগ ও জীবন তাতে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গিকভাবে বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তেইশ বছর পরে জন্মেও, রাশিয়া দেখেও এবং ১৯৪১ সন অবধি বেঁচে থেকেও রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্ব বরণ করতে পারেননি" (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৮৫)। তিনি ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মবাদী তাঁর সৃষ্টিতে সহায়ক ছিলো 'পৌত্তলিকদের দেবতারা'। তবে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার তারিফ করতে শরীফ মোটেও কার্পণ্য করেননি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে বলেছেন, "জগৎ-জীবন-মানুষ ও সমাজ-সাহিত্য সম্পর্কে সংকীর্ণ চেতনায় কবি-মনীষী তিনি" (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৮৩)। ইউরোপ পরিভ্রমণ করেও তিনি স্বকাল চেতনায় অনেক দূরে, পুরাণ চেতনার অনেক নিকটবর্তী। অনুরূপভাবে ত্রিশোত্তর কবিদের প্রগতিপন্থি বলতে দ্বিধায় পড়েছেন সমকালীনতা বর্জিত অন্তর্মুখী কবিসত্তার কারণে। কাজী নজরুল ইসলাম কখনও সাম্যবাদী, কখনও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কখনও বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বে আস্থাবান, কখনও উদার মুমিন কখনও কালীভক্ত। 'যুগান্তরের ধ্বজাবাহী শোষণ মুক্তি ও সাম্যকামী এ মানুষ কি অন্তরেও প্রগতিপন্থী!' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন (আহমদ, ১৯৮৭ : ১৮৮)। প্রাসঙ্গিকভাবে *শিখা, প্রগতি, কালিকলম* পন্থিদের 'প্রগতি' চেতনার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে নাস্তিক্য, আস্তিক্য, প্রগতিশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা, দ্রোহ অনাস্থা সবকিছু বুর্জোয়া সমাজে পাশাপাশি অবস্থান করবে বলে মন্তব্য করেছেন। প্রগতি সম্পর্কে দ্বিধামুক্ত স্বচ্ছ ধারণার আকর বক্তৃতা হিসেবে এ ভাষণ যেমন স্ফটিক দানার ন্যায়, মত-মন্তব্যও তেমন সুগঠিত। শুধু তাই নয় সমাজ অভীপ্সার ক্ষেত্রেও এর রয়েছে নৈয়ায়িক প্রতীতি।

৭. গোবিন্দচন্দ্র দেব স্মারক বক্তৃতা, ১৯৮৭

'মানবতা ও গণমুক্তি' বিষয়ে আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ২০ জুলাই ১৯৮৭ তারিখে গোবিন্দচন্দ্র দেব (১৯০৭-১৯৭১) স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান এবং সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর নীরু কুমার চাকমা।

মোট পাঁচটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে নির্দেশিত হয়েছে মানবতার স্বরূপ। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সমাজে সাহিত্যে রাষ্ট্রে মানবতার স্থিতি বিপর্যয়, গণমুক্তির অন্তরায় অন্ধি-সন্ধির বিচিত্র অনুষঙ্গ এবং কেন মানবতা-মনুষ্যত্ব গণমানুষের মুক্তি আজও সম্ভব হয়নি তার যুক্তিনিষ্ঠ নৈয়ায়িক মননজাত বিশ্লেষণ। বক্তৃতার প্রতিটি ধ্বনি-পদে বিঘোষিত হয়েছে মানবতা এবং গণমানুষের মুক্তির প্রশ্নে তিনি কত দরদি মন-মত মন্তব্য নিয়ে এ পথে অগ্রসর হয়েছেন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ প্রাণী প্রজাতি থেকে দ্বিকর ও দ্বিপদের আশীর্বাদে অনেক উন্নত হয়েছে-হচ্ছে। উৎপাদন উদ্ভাবন আবিষ্কারে মানুষ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সভ্যতার শীর্ষচূড়া স্পর্শ করেছে বলে দাবি করলেও মানবতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীত হয়নি। আর তাই "সুনির্দ্দিষ্ট আত্মিক-সামাজিক প্রয়োজনে অনুশীলনলব্ধ বাঞ্ছিত মানবগুণই মানবতা বা মনুষ্যত্ব" (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮০)।

আস্তিক সাধু-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-ভিক্ষু-ব্রহ্মচারী-দরবেশ-পাদরি শাস্ত্রিক মানবতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় মানুষ আজো প্রাণী প্রজাতি বিশেষ বলে শরীফ উল্লেখ করেছেন (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮০)। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানবতার চরম অবমাননা হয়েছে বলে ড. শরীফ মন্তব্য করেছেন। তার পরেও বলা যাবে না ১৮৮৬ সালে শিকাগোর আন্দোলন সফল হয়েছে। দাসপ্রথা বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও নেই সত্য, কিন্তু কলে কারখানায় দোকানে রেস্তোরাঁয়, গৃহে, ঘাটে মাঠে দেখা যায় সেই পুরাতন ধারার মানসিকতা, "গোষ্ঠীগতভাবে আমাদের মধ্যে যে মানবতা জাগেনি কলি হয়েই রয়েছে...কিছু মাত্র বিকাশ ঘটেছে" (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮৩)। আর এ কারণে "আমাদের সামন্ত-মানসিকতা দুষ্ট বুর্জোয়া সাহিত্যে আজ গণমানব প্রত্যাশিত অবস্থানে অনুপস্থিত" (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮৪)। সমাজতান্ত্রিক দেশে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ত হয়েছে কিন্তু বাকস্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে এবং দু-চারটা জনকল্যাণবাদী রাষ্ট্রে খাওয়া পরার আপাত ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রত্যুষের ঘুম টুটে কেবল অন্ন প্রার্থনায়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় :

> বাংলাদেশে দশ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত তিন কোটি মানুষ নিঃস্ব এবং দিনমজুরী নির্ভর। এদের মধ্যে ভিক্ষাজীবীর পরিজন হবে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ লাখ। এ ন্যূনাধিক তিন কোটি মানুষের ঘুম ভাঙা প্রভাতের প্রার্থনা কি। ধন নয়, মান নয়, শান্তি স্বস্তি আনন্দ আরাম সুখ প্রভৃতিও নয়, প্রার্থিত কেবল একটিই, মর্মোত্থিত করুণ প্রার্থনা আল্লাহ, আজ যেন কাজ জোটে, আজ যেন ক্ষুধার অন্ন মেলে। (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮৪)

আবার নারীর অবস্থা আরও করুণ। কোথাও কোথাও তাদের প্রাণহীন অথবা আধা প্রাণী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সে কেবল রতি রমণে নিষ্ক্রিয় সম্ভোগপাত্রী, বিয়ের পর শাস্ত্র সমাজের নিগড়ে আবদ্ধ। (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮৫-৮৬) তবে উনিশ শতকের শেষপাদে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর নারী পুরুষের সঙ্গে কাজে কর্মে সহাবস্থান করছে। যদিও সেটা আকাঙ্ক্ষিত মানের মাপের নয়। (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৮৭)

এতকাল ধরে রাজা-বাদশা পাদরী শাহ সামন্ত ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে যা করছে তাতে "গণমানবের শোষণ-পীড়ন মুক্তি ঘটেনি, আদর কদরও বেশি হয়নি লালিত কুকুর বেড়ালের চেয়ে" (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৯০)। কারণ "মানবিক-সামাজিক আর্থিক-রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান পন্থাও এদের অচিন্ত্য। কেবল ডাসক্যাপিটাল পন্থীরাই কালসচেতন" (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৯১)। অথবা বলা যায় 'কমুনিস্টরাই আদর্শানুগত্য বলে মানববাদী।' কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কারণ "তবু সমাজবাদে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের রয়েছে ভীতি বা অনীহা। তারা শাস্ত্রে শ্রদ্ধার ও বাক্-স্বাধীনতার দাবিদার। তারা নাস্তিক্য ও বাক্-নিয়ন্ত্রণ বিরোধী। তাই সমাজতন্ত্রে তাদের আপত্তি।...আসলে যে মাত্রায় মানব দুঃখকাতর ও মানব কল্যাণকামী হলে সহজে সানন্দে সমাজ পরিবর্তনে রাজি এবং শোষণ জুলুম থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মানুষ উৎসাহী হয়, সে মাপের মানের মাত্রার উপলব্ধিসম্পন্ন মানববাদী মানুষের সংখ্যা দেশে দেশে স্বল্প, তাই গণমানব আজো সর্ব প্রকারে ও জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে স্বাধিকার বঞ্চিত-শোষিত-দলিত-পীড়িত। (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৯২-৯৩)

অনেক গণতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক দেশে এক দিকে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে মানবতার সেবা প্রচার করছে। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে সেবার নামে ফাঁকির ফাঁক। অন্যদিকে অন্যায়ভাবে দুর্বলের ওপর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছে আবার লোভ দেখানোর জন্য সেখানে পাঠাচ্ছে ত্রাণসামগ্রী যা "হেগেলীয় ডাইলেকটিস বা দ্বন্দ্ববাদের অন্যরূপ।" (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৯৩) কাজেই আর কোন মতবাদ নীতিকথা শাস্ত্রদীক্ষা নয়—

> দেশ, গোষ্ঠী বা জাতিগতভাবে মানবতার বিকাশ ও অভিব্যক্তি না ঘটলে গণমুক্তি তথা সর্বাত্মক মানব মুক্তি ঋজুপথে সম্ভব হবে না কখনো। তাই মানববাদীর উদ্যোগে সংঘটিত বিপ্লবই কেবল গণ-মানবের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে। (নূরুল ও অন্যান্য, ২০০১ : ৯৩)

এমন অভিপ্রায় ড. শরীফ ব্যক্ত করলেও সে বিপ্লবের রূপরেখা কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করেননি। আবার কমুনিস্টরা মানবতার ধ্বজাধারী সাজলেও কমুনিস্ট রাষ্ট্রে প্রজাপীড়ন বিরল নয়, মানবতা সেখানে মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি। তাহলে এ মানবতাবাদী কারা, যারা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে! সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা দেননি। তবে আমরা ধরে নেব, এ মানবতাবাদীরা সকল রাজনৈতিক মতবাদের উর্ধ্বে উঠে শুধু মানববাদকেই সত্য বলে জানবে।

৮. কর্নেল তাহের স্মারক বক্তৃতা, ১৯৮৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তন কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে ১৯৮৯ সালের ২১ জুলাই কর্নেল আবু তাহেরের ত্রয়োদশ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'কর্নেল তাহের স্মারক বক্তৃতা'[১] প্রদান করেন আহমদ শরীফ। বক্তৃতার বিষয় 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি'; আয়োজন করে কর্নেল তাহের সংসদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংসদের সভাপতি ফয়েজ আহমদ।

'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি' বক্তৃতাটি বেশ দীর্ঘ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ষাট। তিনটি পর্বে বিভক্ত এই বক্তৃতার প্রথমে রয়েছে 'ব্রিটিশ পর্ব', দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে 'পাকিস্তান ও বাঙলাদেশ পর্ব' (মুখ্য রাজনৈতিক ধারা) এবং তৃতীয় পর্বে রয়েছে 'বাঙলাদেশ' পর্ব। প্রথম পর্বে দুটি এবং তৃতীয় পর্বে রয়েছে চারটি পরিশিষ্ট। তৃতীয় পর্বের প্রথম পরিশিষ্টটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ১৯৪৮-৮৬ পর্যন্ত বিভক্ত ও ঐক্যের ধারাবাহিকতা সংবলিত একটি ছক; যা আমজাদ হোসেন কর্তৃক রচিত এবং ১৯৮৬ সালের ২৮ নভেম্বর *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত।

বক্তৃতা পাঠে দেখা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচিত্র গতিধারা নিজস্ব চিন্তা চেতনার আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। এতে ইতিহাসের ওপর যেমন তাঁর দখল ও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছে অন্যদিকে ইতিহাসের গতিধারার স্বরূপ উন্মোচনে পারঙ্গম শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

এক. ব্রিটিশ পর্ব

১৭৫৭ সালের পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ-প্রহসনে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহর আকস্মিক পরাজয়ের পর থেকে ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভক্তি পর্যন্ত হিন্দু মুসলিমের যে সব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় এসেছে তার প্রতিটি প্রান্ত ছুঁয়ে বেড়ে উঠেছে আলোচ্য পর্বের বক্তৃতা।

ব্রিটিশ আমল থেকে নয় শুধু তুর্কি মুঘল আমলেও রাজ দরবারে পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কোনো দেশজ মুসলিম ছিলেন না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে (১৮৬১) মুসলিমরা বি. এ পাশ করে বিভিন্ন পদে কাজে যোগদান করেছেন বটে, তবে তাঁরা মুর্শিদাবাদ, কোলকাতা, উত্তর-ভারতের উর্দুভাষী, এদেশি বাঙালি মুসলমান নয়। এতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা ছিল আজকের সমাজের 'এলিট'দের মতোই (আহমদ, ১৯৮৯ : ১০)। উনিশ শতকের শেষ পাদে শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণি চাকুরিতে কাঙ্ক্ষিত অংশীদারিত্ব না পেয়ে ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে উঠল, তাদের ক্ষোভ ক্রোধ রোধ করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করার নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ করল বটে, তবে "হিন্দুদের যুক্তি ছিল দেশমাতা বঙ্গ জননীকে দ্বিখণ্ডিত করা চলবে না। বঙ্গমাতার সন্তানেরা কিছুতেই তা মেনে নেবে না (আহমদ, ১৯৮৯ : ১৩)। ফলে তা রদ হল।

আসলে বঙ্গভঙ্গ রদ বা একক ভারতীয় জাতীয় চেতনা বাঙালি হিন্দুদের মনে কাজ করলেও সেটা ছিল তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। কারণ, 'বঙ্গমাতার অঙ্গ হানি' অনেক আগে থেকেই সম্পন্ন হয়েছিল। কোনো কালেই ভারত একক রাষ্ট্রিক জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অনুরূপভাবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তিতে কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগের অনেক নেতা কর্মীকে বিচলিত করলেও শরীফ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> অবশেষে দ্বিজাতি দাবির ভিত্তিতে নয়, 'মুসলিম প্রধান ও হিন্দু প্রধান অঞ্চল' নীতির ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হল পাকিস্তান ও ভারত নামে। পরিণামে একক রাষ্ট্র হিসেবে এ প্রথম ৭৮১টি সামন্ত রাজ্য নিয়ে আরব সাগর থেকে চীন বর্মা সীমান্ত অবধি বিশাল ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। কাজেই ইতিহাসের আলোকে দেখলে এ উপমহাদেশে প্রথম একটি সংহত জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হল।...অতএব ১৯৪৭ সনে বিভক্তি নয় — কার্যত এক ধরনের সংহতি সাধিতই হয়েছিল, আবহমানকালের বহু বিচিত্র জাতিসত্তা ও জাতি প্রথম দুটো রাষ্ট্রিক জাতিতে, এ মুহূর্তে তিনটে রাষ্ট্রিক জাতিতে স্থিতি পেয়েছে। (আহমদ, ১৯৮৯ : ২২)

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন অভিনব যুক্তিতে। তিনি লিখেছেন :

> এখন মনে হয় এ অমানবিক গণহত্যা ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং ওই অবস্থায় স্বাভাবিক। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু যদি প্রাণভয়ে না পালাত কিংবা উত্তর ভারতের (বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ) শিক্ষিত সম্পদশালী জমিদার মুসলিমরা থেকে যেত, তাহলে পূর্ববঙ্গে মুসলিমরা অর্থ সম্পদ-চাকুরী ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কি প্রসাদ পেত? উত্তর ভারতেও বা অনগ্রসর হিন্দুরা অর্থ-সম্পদে জমি-জমায় ঋদ্ধ হত কি করে?...তাই সেদিনকার সে অবস্থায় ও সে অবস্থানে নরহত্যা বা দাঙ্গা ছিল প্রতিযোগী বিভাগের প্রায় একমাত্র গণ উপায়। (আহমদ, ১৯৮৯ : ২৩)

মূলত আহমদ শরীফের এ ধরনের আলোচনার মূল প্রেরণা হল এদেশীয় হিন্দু-মুসলমানের অতীত সম্পর্কে অবহিত হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ সতর্কতার সাথে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

দুই. পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্ব (মুখ্য রাজনৈতিক ধারা)

এ পর্বে যে সমস্ত বিষয়কে ঘিরে বক্তৃতা বেড়ে উঠেছে তাহল '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, '৫৮-র আয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৫-র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, '৬৬-র ছয়দফা, '৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৭২-৭৫ পর্যন্ত অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, '৭৫-এর মুজিব পরিবারের নৃশংস হত্যা, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহি জনতার উত্থান, কর্নেল তাহের হত্যা (১৯৭৬) এবং জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ ইত্যাদি। গণমানুষের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানের শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে নিবৃত্তির প্রয়াসে

বাঙালি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এবং স্বশাসন স্বাধিকার পেল বটে কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কাজেই আম জনতার ভাতে কাপড়ে, খেয়ে-পরে বেঁচে বর্তে থাকার দাবিতে লড়াই করা প্রয়োজন বলে আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন।

তিন. বাংলাদেশ পর্ব

বাংলাদেশ পর্বের আলোচনায় দেখা যায়, '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাঙালি জাতীয় চেতনার যে উন্মেষ ঘটে এবং এর অংশ হিসেবে 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের ওপরে টক্কা দিয়ে 'প্রগতিশীল' রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর বিপ্লবী ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব বিশ্লেষণ উপর্যুক্ত পর্বের অন্যতম দিক।

আল ইসলাম, *ইসলাম প্রচারক*, *কোহিনূর*, *সওগাত*, *মোহাম্মদী* ও *মাহেনও* প্রভৃতি পত্রিকা এবং 'বাংলা ভাষা বানান সংস্কার আন্দোলন', 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস', 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' (১৯৫২), 'সিপাহী বিপ্লব বার্ষিকী' (১৯৫৭), 'রওনক' (১৯৫৮), 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' (চট্টগ্রাম, ১৯৫৮), 'Bureau of National Reconstruction' (BNR), 'Pakistan Writers Guild' প্রভৃতি সম্মেলন সংস্থাগুলোর মধ্য দিয়ে 'ইসলাম পন্থী', 'প্রতিক্রীয়াশীল', 'বুদ্ধিজীবীরা', 'বেরাদরীভাবে বিগলিত হয়ে' পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয়তায় আস্থা এনেছে। অন্যদিকে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ','সংস্কৃতি পরিষদ' (চট্টগ্রাম, ১৯৫১), 'প্রান্তিক' (চট্টগ্রাম, ১৯৫১), 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' (কুমিল্লা, ১৯৫২), 'কাগমারী সংস্কৃতি সম্মেলন' (টাঙ্গাইল, ১৯৫৭), 'ছায়ানট' (ঢাকা, ১৯৬১), 'মহাকবি স্মরণোৎসব' প্রভৃতি সম্মেলন ও সংঘের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তানের ইসলামি জোসের ফাঁকির ফাঁকে আঘাত হেনে স্বায়ত্ত শাসন থেকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে — দেশ স্বাধীন করেছে। তবে ১৯৪৮ সালে "পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হলেও একে তো সরকারের ও সামন্ত বুর্জোয়ার চোখে কম্যুনিষ্ট হচ্ছে নাস্তিক, দুষ্কৃতী, আর কম্যুনিজম মানে নীতি-নিয়ম ও ধর্মহীনতা, তার উপর কম্যুনিষ্টরা ছিল মুখ্যত হিন্দু সন্তান" (আহমদ, ১৯৮৯ : ৫৭) বলে উল্লেখ্যযোগ্য কোনো ভূমিকা পাকিস্তান আমলে রাখতে পারেনি। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর মারা-কাড়ার বুর্জোয়া রাজনীতিতে, সিরাজ শিকদার এবং কর্নেল তাহেরসহ আরও অনেক বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ-দ্রোহের ভয়ে তাঁদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট কমরেড যাঁরা আছেন তাঁরা ক্ষমতায়-লোভে-পদলেহনে ভাগাভাগিতে আত্মহারা হয়ে পড়েন। আর নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তো আছেই। ফলে "...ষাটের সত্তরের ও আশির দশকে যখন মুসলিমরা লাখে লাখে শিক্ষিত হচ্ছিল, বেকার হচ্ছিল, অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে আর্থিক দৈন্যের চাপে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে, প্রতিকারের উপায় খুঁজছে, ক্ষোভে-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তখনই (১৯৬৬-৬৭ সনে এবং পরেও) কম্যুনিস্টরা তাঁদের আদর্শের ও প্রেরণার

উৎসভূমে ক্রুশ্চেভের মাও-সে-তুঙের তাত্ত্বিক, আদর্শিক ও প্রায়োগিক দ্বন্দ্বে পক্ষাবলম্বন করে নিজেরাই পরস্পর বিবাদের ও বিচ্ছেদের শিকার হলেন। এবং স্ব স্ব ক্ষুদ্র দল ও শক্তি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ফেল ব্যর্থতাকেই, নিষ্ফলতাকেই, হতাশাকেই এমনকি বিলুপ্তিকেই বরণ করলেন" (আহমদ, ১৯৮৯: ৫৮)। তবুও তেভাগা, টঙ্ক, গুলা, খাড়াভাগ, মকরাভাগ, প্রভৃতি গণআন্দোলন মূলত কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়ে আব্দুল হক, তোয়াহা, মণি সিং, সিরাজ শিকদারের আন্দোলন সংগ্রামের কথা শিক্ষিত জনের অজানা নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক কর্নেল আবু তাহের বিপ্লবী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আপাত সাফল্য লাভ করলেও তাতে গণদীক্ষা ও গণপ্রস্তুতি ছিল না বলে তার প্রভাব লেশ-রেশ আজ দুর্লক্ষ্য।

এভাবেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সমর্থক আহমদ শরীফ তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এ কথাই বলতে চেয়েছেন, "এতো ভাঙনের ও মত বিরোধের পরেও কম্যুনিজমের কোন বিকল্প নেই শোষিত মানব মুক্তির জন্য" (আহমদ, ১৯৮৯ : ৫৯)।

৯. নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১৯৯০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়াত অধ্যাপিকা নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৪০-১৯৮৯) স্মরণে প্রথম 'নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা'। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শিক্ষা সেকালে ও একালে'। বক্তা আহমদ শরীফ। বক্তৃতাটির কলেবর বেশ দীর্ঘ এবং গবেষণালব্ধ। এগারটি উপ-পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সেকাল একালের শিক্ষাদান পদ্ধতি, ধরন প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক-পণ্ডিতের 'Education in Ancient India' বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসহকারে একটি তত্ত্ব-তথ্যনির্ভর বক্তৃতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। কিন্তু বক্ষ্যমাণ বক্তৃতাটি একটু ব্যতিক্রমী এজন্য যে, এখানে শিক্ষা সম্পর্কে আহমদ শরীফের সমগ্র শিক্ষক জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতার সার কথা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গবেষক উল্লেখ করেছেন :

> গোড়ায় যারা শাস্ত্রে শিক্ষা নিত গুরুগৃহে বাস করে তাদের বলা হত 'অন্তেবাসী' আর যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় বৈষয়িক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত তারা পরিচিত হত 'দণ্ডমানব' নামে। ক্ষত্রিয়রা (রাজপুত্ররা) কল্পশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, নাচ-গান-বাজনা চিত্রাঙ্কন ও কাব্যাদি শিখত। পাণিনিই প্রথম শিক্ষার্থীমাত্রকেই ছাত্র, নামে অভিহিত করেন।...
> গোড়া থেকে শাহ-সামন্ত-ধনীরা স্বগৃহে শিক্ষক রেখে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। মাঝারি বিত্তের লোকেরা গাঁয়ের থেকে দূরস্থিত নির্জন অরণ্যবাসী আপাত বিবাগী বিষয়বিরাগী তপস্বী মুনি ঋষির আশ্রমে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সন্তান পাঠাত, তারা বেতন দিত। বিনা বেতনে যারা শিক্ষা গ্রহণ করত তারা কার্যত দাসত্বই বরণ-করত। গুরুগৃহের

> সমুদয় কাজ শিষ্যকে করতে হত। সমিদ ও জল আহরণ, যজ্ঞবেদী পরিষ্কার করা, গোচারণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, শস্য ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি শিষ্যগণের কর্তব্য ছিল। তাদের ভিক্ষাচরণ করতে হত। [কল্যাণী কার্লেকর, ভারতের শিক্ষা, ১ম খণ্ড, ১৩৬১/৬৫ ১ম সং, পৃ. ২৫] কেননা তারা গুরু মুনির বা ঋষির জন্যে অন্ন ভিক্ষে করত গাঁয়ে গাঁয়ে গুরুগৃহে গরুর পরিচর্যা করত, গৃহ ভৃত্যের কর্তব্য কাজও তাদের করতে হত। পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হত বলে দিনান্তে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। ক্লান্তি নিয়ে বিকেলে গুরুর পাঠ গ্রহণ করত মুখে মুখে, ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, ছন্দে এবং বেদাদি শাস্ত্রে। বিদ্যামাত্রই ছিল মুখস্থ বিদ্যা। তাই শিক্ষা গ্রহণের গতি ছিল মন্থর ও মাত্রা ছিল সামান্য। ফলে ছাত্রের কোন বিদ্যালয় পারঙ্গম হয়ে গুরুগৃহ ত্যাগ করতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ হারাতে হত। এ অংশের নাম ব্রহ্মচর্যকাল। মোটামুটি প্রায় পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর লেগে যেত মন্দ ও মাঝারি মেধার শিক্ষার্থীদের। যে কোন বিষয়ে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি শিখতে মেধাবী ছাত্রেরও বারো বছর লেগে যেত। ...কালান্তরে সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিবর্তন ধারায় সম্ভবত কাব্য নাটক এবং পুরাণ ও স্মৃতি-উপনিষদ রচিত হওয়ার কাল থেকে পাঠ্য বিষয়ে শাস্ত্র ছাড়াও রামায়ণ মহাভারত জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, কাব্য, নাটক, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি যুক্ত হতে থাকে। তবে এগুলো কালিদাস ভবভুতি শূদ্রকের কালেই প্রসার লাভ করে বলে অনুমান করা যায়। (আহমদ, ১৯৯০ : ১২-১৩)

এর পর মধ্যযুগের শিক্ষা-পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুর, সার্বিক পরিস্থিতির তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

> তুর্কী আমল থেকেই বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী শাসক-প্রশাসক থাকত ইকতায়, কশবায়, থানায় অর্থাৎ প্রশাসন কেন্দ্রে, দেশজ মুসলিমরাও ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত ক্ষুদ্র পেশাজীবী দরিদ্র এবং সংখ্যায়ও ছিল পনেরো শতক অবধি গাঁয়ে গাঁয়ে নিতান্ত স্বল্প। তাই প্রশাসনিক গরজেই প্রাত্যহিক জীবনের বৈষয়িক ব্যবহারিক প্রয়োজনানুগ সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হল। এগুলোরই নাম পাঠশালা। মুসলমান অধিকারের পরই বাংলা পাঠশালা শিক্ষা একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নেয়। [পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষা ধারা*, ১৯৮৯ : ১৭৭] এ পাঠশালায় ইহজাগতিক জীবনের জরুরী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত। এভাবেই 'বাংলা ভাষা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। (আহমদ, ১৯৯০ : ১৮)

এই পাঠশালায় অস্পৃশ্য অচ্ছুত ব্যতীত সবাই পড়ার সুযোগ পেত। হিন্দু সন্তানদের পাঁচ বছর বয়স হলেই 'হাতে খড়ি' হত এবং তাদের শিক্ষক থাকতেন বর্ণ হিন্দু। মুসলমান সন্তানের 'তখতি হাতে' হতো চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে। মুসলিম শিক্ষকের পাঠশালায় অন্ত্যজ শ্রেণির হাড়ি ডোম ছাত্ররাও পড়ার অধিকার পেত বলে গবেষক জানিয়েছেন। আধুনিক কালের ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন :

> ইংরেজরা কালোপযোগী শিক্ষাদানের ও গ্রহণের য়ুরোপীয় উন্নত নীতিনিয়ম, রীতি রেওয়াজ, প্রথা পদ্ধতি পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করল, যা এদেশের ছিল সর্ব প্রকারের অজ্ঞাত। শিক্ষাতত্ত্বটি হচ্ছে নৈতিক, আর শিক্ষানীতিটি হচ্ছে বৈষয়িক। প্রথমটি মানবিক, দ্বিতীয়টি জৈবিক। একটি জীবনসম্পৃক্ত, অপরটি জীবিকালগ্ন। একটি চেতনাসঞ্জাত মানববিদ্যা,

> অপরটি বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিবিদ্যা। একালে স্বাস্থ্যপাঠ, ব্যায়াম চর্চা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র ক্রমগুরুত্বে ও ক্রমবিস্তৃতভাবে বছরে বছরে স্তরে স্তরে পাঠ দানের ও গ্রহণের সময়-মাপা নিয়মে বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক ব্যবস্থাদি ইংরেজদেরই দান। (আহমদ, ১৯৯০ : ২২-২৩)

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, ইংরেজ শাসক-প্রশাসক অধিকারে উৎপাদনে শিক্ষায় রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে গোলক ধাঁধা বাঁধিয়ে এদেশে হিন্দু-মুসলিমের মন-মননের বিকাশের পথ রুদ্ধ রেখেছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর সরল রৈখিক একটা মন্তব্য টেনেছেন এভাবে :

> কাজেই গোড়ায় বিদ্যামাত্রই ছিল ব্রহ্মবিদ্যা, পরে তা প্রসৃত হল শাস্ত্রশিক্ষায়, তার শাখা প্রশাখা হল বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য, ন্যায় বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি ষড়দর্শন, জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শন, ব্রাহস্পত্য-চার্বাক দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রশিক্ষা। মুসলিমদের মধ্যেও তা ছিল কেবল দীন-ই-এলম্।
>
> এর সঙ্গে হইজাগতিক চিকিৎসা ভেষজ, কৃষি, শিল্প, গণিত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিদ্যারও চর্চা বা অনুশীলন চলল।
>
> তুর্কী-মুঘল আমলে সর্বপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ ঘটেছিল কাগজে পুথির বহুলতায় এবং শিক্ষকের সুলভতায়। ব্রিটিশ আমলের উন্নত সুশৃঙ্খল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ধারা আজো প্রচল। (আহমদ, ১৯৯০ : ২৮)

এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাগতিক জীবনের বিচিত্র জ্ঞান বের হয় ঠিকই কিন্তু মানবিক গুণাবলিরিক্ত শিক্ষার ফলে মানবতা আজ ভীষণ সংকটের সম্মুখীন। ফলে "সব শাখার শিক্ষার্থীদের জন্যে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আইন ও মনোবিজ্ঞান এ ছয়টির যে-কোন দুটো বিষয় অন্তত সংক্ষিপ্তভাবে আবশ্যিক পাঠ করা জরুরী" (আহমদ, ১৯৯০: ২৯-৩০)। এ প্রসঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন তিনি। কারণ এতে 'সনদ' পেয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে বটে, তবে 'সমাজ স্বাস্থ্য' উন্নত হচ্ছে না। আর সরকার বৃত্তিমূলক কেজো শিক্ষার নামে উচ্চ শিক্ষা সংকোচন করছেন। রাজনৈতিক দলগুলোও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে বেকার সমস্যার সমাধান চায়। ১৯৫৩ সালের শরীফ কমিশন থেকে শুরু করে ১৯৮৩ সালের আবদুল মজিদ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও সে সত্যের প্রতিধ্বনি বর্তমান রয়েছে বলে আহমদ শরীফ উল্লেখ করেন (আহমদ, ১৯৯০ : ৩১)। পরিশেষে একালের শিক্ষানীতি কেমন হবে সে-সম্পর্কে বলেন :

> বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল নির্ভর এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে এসব বিদ্যার বা বৃত্তির গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিনে, সে-সঙ্গে মানুষ যেন কেবল 'রবোট' হয়ে না ওঠে, যুগপৎ ও একাধারে কাজের লোক ও 'মানুষ' হয়ে ওঠে — এ-ই আমাদের কাম্য। সমাজ চায় মানবিক গুণের 'মানুষ', পরিবার চায় রোজগেরে সদস্য, আর রাষ্ট্র চায়, কাজের লোক। কিন্তু মানবতার বা মনুষ্যত্ববিরহী ব্যক্তি কারো সম্পদ নয় তাকে দিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র চলতে পারে না। যৌথজীবনের ভিত্তি ও বন্ধন হচ্ছে মানবতা। শিক্ষায় সে-ভিত্তি ও বন্ধন দৃঢ় রাখার সতর্ক সযত্ন প্রয়াস থাকা আবশ্যিক। (আহমদ, ১৯৯০ : ৩২)

১০. কবি মতিউর রহমান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতামালা, ১৯৯২

১৯৯২ সালের ২ ও ৩ মার্চ কবি মতিউর রহমান স্মারক বক্তৃতামালা হিসেবে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন আহমদ শরীফ।[২] ২ মার্চ স্মারক বক্তৃতামালা উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান মিয়া; স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের মিলনায়তন কক্ষ। ওইদিন সকাল দশটায় আহমদ শরীফ 'সংস্কৃতি' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩ মার্চ দুটি বক্তৃতা প্রদান করেন যথা 'সাংস্কৃতিক তথা আচারিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা রক্ষণশীলতা ও অপ-সংস্কৃতি' এবং 'বিকাশের পথে অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতি।' উপর্যুক্ত বক্তৃতাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত করে প্রকাশ করে ১৯৯২ সালে।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কথাটা উচ্চারণ করা সহজ কিন্তু এর তাৎপর্য বোঝা ও বোঝানো খুবই কঠিন। এজন্য প্রতীচ্যদেশে এর ১৬৪টি সংজ্ঞার্থ চালু থাকলেও কোনটাই সর্বজনীনতা লাভ করতে পারেনি, এসব বিষয় সামনে রেখেই আহমদ শরীফ 'সংস্কৃতি' বিষয়ে বক্তৃতা প্রস্তুত করেছেন।

গভীর বা ব্যাপক তাৎপর্যে সংস্কৃতি হচ্ছে "মনুষ্যত্বেরই নির্যাস অথবা নামান্তর কিংবা মনুষ্যত্বের বা মানবতার প্রতীক, প্রতিম, প্রতিভূ বা প্রতিরূপ" (আহমদ, ১৯৯২ : ৮)। এই বক্তৃতায় সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ, উৎস, উপাদান, স্বরূপ, প্রকৃতি, রকমফের প্রভৃতি সারা জীবনের ঋদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করেছেন।

পরিস্রুত জীবন চেতনাই সংস্কৃতি। যা সর্বদা গতিশীল প্রবহমান নদীর মতো। ব্যক্তির গোত্রের দেশের আবিষ্কার উদ্ভাবন, আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি পায় স্বকালে স্বদেশে সংস্কৃতির মর্যাদা। ব্যাপক কলেবরে সংস্কৃতির আলোচনা শেষে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেছেন :

> ...যথাসময়ে ও যথা প্রয়োজনে উঁচুমানের মানবিক গুণের যথা সংযম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সহানুভূতি- সৌজন্য-সুরুচি-সৌন্দর্য বোধের এবং স্নেহ-প্রীতি-মমতার অনুশীলনে সমাজে সহস্বার্থে সহযোগিতায় সহাবস্থানের যোগ্যতা অর্জনই সংস্কৃতি। (আহমদ, ১৯৯২ : ২৩)

সংস্কৃতির উৎস 'মানবমনীষা' হলেও "প্রধান উৎস ঈশ্বর-প্রোক্ত ধর্ম শাস্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক নীতিনিয়ম, রীতি রেওয়াজ, আচার আচরণ এবং পালা পার্বণ।" (আহমদ, ১৯৯২ : ১৫)

সংস্কৃতি অর্থ-নিরপেক্ষ কোনো জীবনাচার নয়। এর মর্মস্থলে অর্থের সাড়ম্বর উপস্থিত বলেই শাজাহানের তাজমহল আজ বৈশ্বিক সংস্কৃতির মডেল।

লোকসংস্কৃতির বিলুপ্তি বিষয়ে একশ্রেণির বিদ্বান-পণ্ডিত আবেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও তিনি তাদের কপট মায়া কান্নায় আঘাত হেনে বলেছেন :

> আজকাল কিছু বিদ্বান এ গুলোর বিলুপ্তির জন্যে আফসোস করেন, তাঁদের ইচ্ছে কিছু জেলে সাপুড়ে অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন লোক থাকুক, যারা মাটির হাড়ি সরা, বেতের বা বাঁশের ঝাঁপি, রশির সিক্কা আজো ব্যবহার করতে থাকুক, আর তার আঞ্চলিক গ্রাম্য বুলিতে বেসুরো গান বাঁধুক, চেতালা বেসুরো তাল লয়ে নাচুক, আর নিজেরা সন্তান য়ুরোপীয় আদলে জীবন যাপন করে ওদের চিরকালের মতো অজ্ঞ গেঁয়ো গরীব লোকরূপে বাঁচিয়ে রেখে শাহরে লোকলোরের, সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের, সাহিত্যের সম্মেলন সনিদর্শন সম্মেলন করে ধন্য ও কৃতার্থ হোন। (আহমদ, ১৯৯২ : ২৫)

সংস্কৃতির স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণে যে অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য-উপমা-উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন তাতে বলা যায় 'সংস্কৃতি'র আলোচনায় আহমদ শরীফের *সংস্কৃতি* যোগ করেছে নতুন মাত্রা। পরিশিষ্টে প্রাচ্য প্রতীচ্যের বেশ কয়েকজন পণ্ডিতের সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ উদ্ধৃত করেছেন।

সাংস্কৃতিক তথা আচারিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা, রক্ষণশীলতা ও অপসংস্কৃতি

এ বক্তব্য পরিস্ফুটনে আহমদ শরীফ কোনো তত্ত্ব-দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। গোত্র, সমাজে, শাস্ত্রে, রাষ্ট্রে প্রচলিত ব্যক্তি মানসের ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি আচরণগত প্রবণতাই আলোচনার মূল বিষয়। ব্যক্তির আত্মসত্তার ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ক্ষেত্রে অবচেতন অথবা সচেতন প্রয়াস প্রায়শ চোখে পড়ে। এর মূলে থাকে রক্ষণশীলতা তথা ঐতিহ্যপ্রীতি। যেমন "বাঙালীর জল ও পানি, ধুতি ও তহবন পাজামা এগুলো শাস্ত্রিক নয়, ঐতিহ্যিক রক্ষণশীলতা" (আহমদ, ১৯৯২ : ৩৫)। এগুলো বাঙালি হিন্দু মুসলমান স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঠিকমত বজায় রেখেছে। অনুরূপভাবে আসনে-বসনে, চুল-দাঁড়ি টিকিতে, চলায়-বলায় লেখায় ধর্মীয়-সামাজিক শিক্ষা-রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নীতি নিয়মে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-মুসলমান সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে যুগ যুগ ধরে। অথচ মানবতার বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পরিহার করা একান্ত জরুরি বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

> পরিচর্যার জন্যে, মনুষ্যত্বের বা মানবতার বিকাশের জন্যেই, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক, গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি পরিহার করে মানব-উত্তরাধিকারে আস্থাবান হয়ে যেখানে যা কিছু কল্যাণকর ব্যবস্থার উপযোগী ও প্রয়োজনীয় এবং গুণ-মান-মাপ-মাত্রার বিচারে শ্রেষ্ঠ তা-ই গ্রহণ বরণ অনুকরণ অনুসরণ করা আবশ্যিক ও জরুরী। (আহমদ, ১৯৯২ : ৪৮)

নইলে সংকীর্ণতার রক্ষণশীলতার মরা নদীতে আবদ্ধ হলে মানবতার তথা-মনুষ্যত্বের উত্তরণ না ঘটলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে আসবে বিপর্যয়। তাই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে আস্থা রাখা পুরাতন প্রীতি বা রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ হওয়া সংস্কৃতির

অপমৃত্যুরই নামান্তর বলে আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন। অপসংস্কৃতি বলে যেটা সমাজে-রাষ্ট্রে ব্যক্তিমনে চালু রয়েছে তাও আপেক্ষিক। কারণ, একের সংস্কৃতি হচ্ছে অপরের অপ-সংস্কৃতি। স্থান কাল পাত্র ভেদে মানুষের মন রুচি শিক্ষা-দীক্ষা সমাজ-ধর্ম ভিন্নতায় বিভক্ত বলে তাকে অপসংস্কৃতি অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে না। যেমন :

> একজন মুয়াজ্জিন বা ইমাম পুরোহিত পূজারী স্যুট পরে ইমামতি বা দেবতাপূজা করতে গেলে তা হবে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে-মনে অপসংস্কৃতি। আমাদের নারীরা সালওয়ার কামিজ পরলে হয়তো অপসংস্কৃতি হবে না, কিন্তু প্রতীচ্য নারীর স্কার্ট নিশ্চয়ই আমাদের চোখে অবাঞ্ছিত অশ্লীল নগ্ন অপসংস্কৃতি। অথচ পাশ্চত্যে তা-ই সংস্কৃতি। (আহমদ, ১৯৯২ : ৫০)

এমন সাদৃশ্য অথবা তুলনামূলক আলোচনার ফর্দ না বাড়িয়ে বলা যায় স্বকালে স্বসমাজে স্বদেশ কল্যাণমূলক নতুন চেতনাপ্রসূত সৃষ্ট সামাজিক রীতি-নীতিই সংস্কৃতির মর্যাদা পাবে — "যদিও বা নতুন মাত্রই বয়স্কদের চোখে অপসংস্কৃতি ও নতুন অনাচার বলেই চিরকাল প্রতিভাত হয়, তাতে নতুনকে, পরিবর্তনকে বিবর্তনকে প্রতিরোধ করা যায় না" (আহমদ, ১৯৯২ : ৫৪)।

বিকাশের পথে অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতি

অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য কী কী অন্তরায় রয়েছে এবং কীভাবে সে অন্তরায় থেকে উত্তরণ সম্ভব এসব বিষয় এ বক্তৃতায় স্থান পেয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন, যাদুশক্তি ট্যাবু টোটেম, ধূলি পড়া, পানি পড়া, ঝাড় ফুঁক-তুকতাক, বাণ উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলি, তাবিজ-তাগা, কবচ-কুণ্ডল, অষ্টধাতু পাথর মণি প্রভৃতির ওপর মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আত্মকল্যাণের জন্য নির্ভর করে আসছে। মানুষ বিশ্বাস রাখে শাস্ত্র-নবী অবতার আকাশবাসী দৈববাণী ভূত-প্রেত-দেও-দানব-দৈত-গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র নজম প্রভৃতি তাদের কল্যাণ অকল্যাণে ভূমিকা রাখে বলে। তাহলে স্রষ্টাকে কেন সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসেবে মানবে? আর স্রষ্টাই যদি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ওই সমস্ত অরিদেবতা, মিত্র শক্তির ওপর আস্থা রাখা কেন? যা বৈশ্বিক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য বড় অন্তরায় বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (আহমদ, ১৯৯২ : ৬৪)। আসলে বাঙালির শিক্ষাদীক্ষায় সাংস্কৃতিক জীবনে কোন মহৎ অর্জন নেই, তাই অজ্ঞ অসহায় মানুষ আপাত মুক্তির জন্য বিভিন্ন উপশক্তি-অপশক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর 'ভয় থেকে ভগবানের উৎপত্তি' জেনেছে বলে স্বকালে-স্বসমাজে শৈশব থেকে 'মগজ ধোলাই' হওয়ার কারণে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পাওয়ার পরেও বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারছে না বলে আজো চিন্তা চেতনায় বাঙালি নয় শুধু পৃথিবীর দরিদ্রপীড়িত অধিকাংশ দেশের মানুষ আধিগ্রস্ত (আহমদ, ১৯৯২ : ৭৫)। তবে এ কথা ঠিক পৃথিবীর শিক্ষিত ধনী লোকের সংস্কৃতি চর্চা যে একই মানে মাপে মাত্রায় অর্থাৎ ধনী মানী শিক্ষিত লোকের সংস্কৃতি বৈশ্বিক পর্যায়ের এবং আমাদের সমাজ-জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সমৃদ্ধ

সংস্কৃতি চর্চা করি তা প্রতীচ্য নির্ভর একথা অস্বীকার করা যাবে না (আহমদ, ১৯৯২: ৭১-৭৩)।

কিন্তু বৈশ্বিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শাস্ত্র একটি বড় বাধার কারণ স্ব স্ব জাতি ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজ শাস্ত্র-ধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যত রক্তপাত করেছে তা অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি। আর শাস্ত্র যে 'ঈশ্বর প্রোক্ত' তারই বা প্রমাণ কী? ঈশ্বর থাকলেই কি শাস্ত্র মানতে হবে? অন্যান্য সৃষ্টি তো মানে না? আর শাস্ত্রই যদি ঈশ্বর প্রোক্ত হবে তবে যুগে যুগে শাস্ত্রে এত বৈসাদৃশ্য কেন? (আহমদ, ১৯৯২ : ৬৬-৬৯) এসব বিষয়ে প্রশ্ন টেনে শরীফ বলেছেন, বড়জোর ঈশ্বর মানো আর শাস্ত্র নয় মানুষকেই সত্য জ্ঞানে জানো তাহলে বৈশ্বিক সংস্কৃতি চর্চা সহজ হবে। মানবতা মুক্তি পাবে সংস্কৃতির বিকাশ হবে।

১১. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বক্তৃতা, ১৯৯৩

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সপ্তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০ ও ২১ মে ১৯৯৩ শিশির মঞ্চে দুইজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ভাষণ দেন। তাঁরা হলেন : অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অশোক মিত্র (বিষয় : শতাব্দী ও সাহিত্য) ও আহমদ শরীফ (বিষয় : বাঙালীর জ্ঞাতিত্ব বন্ধন)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আকাদেমির সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়। আহমদ শরীফের এ বক্তৃতাটি পরে *প্রগতির বাধা ও পন্থা* (১৯৯৪) গ্রন্থে স্থান পায়।

'বাঙালীর জ্ঞাতিত্ব বন্ধন' একটি ক্ষুদ্রকায় বক্তৃতা।[৩] বক্তৃতায় বাঙালির জ্ঞাতিত্ব বন্ধনের ভিত্তি কীসে কীভাবে মজবুত হবে এ বিষয় নিজস্ব উপলব্ধির সহজ সরলীকরণরূপ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। জাতির কল্যাণে স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে জাত জন্ম নির্বিশেষে মানুষ পরিচয়কেই বড় করে দেখতে হবে। চিন্তা চেতনায় বৈশ্বিক নাগরিক হওয়ার জন্য সমকালীনতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এজন্য তিনি এ বক্তৃতায় এক জাতি এক ভাষা এক দেশ এক বিশ্ব ব্যবস্থাপনার উপযোগী মানসিকতা পোষণ করতে হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন, উভয় বাংলায় নয় শুধু, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জাতিগত ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি এক অঞ্চলের ভাষার সাথে অন্য অঞ্চলের ভাষার কোনো মিল নেই। "তবু আমরা লেখ্য বা লিখিত বাঙলা ভাষার বন্ধন সূত্রে অভিন্নমূল রশুনের মতো মনে মগজে মর্মে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, বাঙলা ভাষাই আমাদের আত্মীয়তার, জ্ঞাতিত্বের, অভিন্নজাতি সত্তার উৎস, ভিত্তি ও বন্ধনসূত্র ও স্মারক (আহমদ, ১৯৯৪ : ৬২)।

১২. বনফুল স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৪

শরীফ ১৯৯৪ সালে ৪ ও ৫ মে বরীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বনফুল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয় 'বাঙলা সাহিত্য চর্চায় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা'।[৪]

বক্তৃতায় নতুন কোনো তত্ত্ব তথ্য সত্য নেই। পুরাতন বিষয়ের নতুনরূপে প্রকাশ মাত্র। বক্তৃতাটি *সময়-সমাজ-মানুষ* গ্রন্থে (১৯৯৫) অন্তর্ভুক্ত হয়। মধ্য যুগ থেকে হিন্দু-মুসলমান দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে পির-নারায়ণ 'সত্য' কে নিয়ে উভয় সম্প্রদায় একমতে একপথে চললেও তাতে রয়েছে বাঙালির ক্ষয়িষ্ণু মনের পরিচয়। অন্ত্যমধ্য যুগ থেকে বর্তমান অবধি হিন্দু-মুসলিম সাহিত্য চর্চায় মনে মেজাজে কেউ পরিচয় দিল 'হিন্দু' কেউ 'মুসলমান' কেউ মানুষ পরিচয় দিল না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ধর্তব্য নয়। অথচ একথা সত্য, স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব দিলে আদিম পশুসুলভ আচরণ অতিক্রম করা যায় না। (আহমদ, ১৯৯৫ : ১২৪)। বর্তমান পাশ্চাত্য জগৎ ও জীবন যেমন দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে-হচ্ছে, সে জীবনের সাথে বাঙালির এ দীন-দুর্বলজীবন যোগ করতে হবে। সুস্থ-স্বস্থভাবে বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য আজ সহাবস্থান প্রয়োজন। স্বাতন্ত্র্য নয়, যুক্তিবাদিতা, বিজ্ঞান মনস্কতা মানবতা যেন ঠাঁই পায় আমাদের সাহিত্যে সে প্রত্যাশাই এ বক্তৃতায় প্রার্থনীয় হয়ে ফুটে উঠেছে এভাবে :

> অতএব, আগের মতো কেবল হিন্দুর জন্যে, কেবল মুসলমানের জন্যে, কেবল সমাজবাদীর কিংবা পুঁজিবাদীর জন্যে ও স্বার্থে কোন সাহিত্য রচিত হতে পারবে না। এখন সাহিত্য হবে একাধারে ও যুগপৎ মানুষের প্রয়োজনের, বিনোদনের, আনন্দের, বেদনার ও গাঢ় গভীর অনুভবের ও উপলব্ধির অবলম্বন এবং ফুল, ফল ও ফসল। ...এক কথায় 'মানুষ' ও মানবতাই হবে সাহিত্য শিল্প দর্শনের বিষয় (আহমদ, ১৯৯৫ : ১৩৪)।

১৩. আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৭

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে ১০ এপ্রিল ১৯৯৭ বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ 'আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি শামসুর রাহমান। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন আহমদ শরীফ। বিষয় : 'যুক্তি জিজ্ঞাসা ও চিন্তার মুক্তি'। আহমদ শরীফ আজীবন মুক্তবুদ্ধিতে বিজ্ঞানমনস্কতায় আস্থাশীল ছিলেন। জীবনের শেষ দশকে এ বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধে-বক্তৃতায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। এই বক্তৃতা মূলত সেই প্রেরণারই স্বতোৎসারিত ফল।

আজও মানুষ গুণে মানে মাপে মাত্রায় বড়জোর প্রাণী প্রজাতিবিশেষ। তাঁর চিন্তার বুদ্ধির মনের আজও বিকাশ হয়নি। "কেননা জন্মের পর থেকেই সে দৃষ্টি, শ্রুত ও লুব্ধ পারিবারিক, সামাজিক, স্থানিক, লৌকিক, অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাস সংস্কার ধারণা দিয়ে মন-মনন শৃঙ্খলিত ও পাথুরে দুর্গাবদ্ধ করে ফেলে। ফলে তার জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা তরুর মতো শাখা-পল্লবে বিকাশ বিস্তার পায় না" (আহমদ, ১৯৯৭ : ৩)। এই আধি মুক্তির জন্য কৈশোর থেকে অন্তত নব যৌবনকাল পর্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন চালিত করতে হবে। এভাবে জীবন যাপন 'লাখে মিলয় এক' — আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন এধারারই একজন বলে বক্তৃতায় তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে।[৫] আদ্যিকালের ঝাড় ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, ভূত-প্রেত, পিশাচ, ড্রাগন, পাথর,

রাশি, সবই যুক্তির কষ্টি পাথরে মিথ্যে প্রমাণ হচ্ছে। "কাজেই যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের তথ্য আমাদের মনের ভূত-ভগবান, প্রেত পিশাচ তাড়িয়ে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত মনের মুক্ত বুদ্ধির, মুক্ত মগজের, মুক্ত মননের, মুক্ত মনীষার, মুক্ত মানুষরূপে মানবিক গুণের আধার, প্রমূর্ত মানবিকতা বা মনুষ্যত্বরূপে গড়ে তুললেও সমাজ পরিবর্তন করে প্রতিটি মানুষকে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার সুযোগ সুবিধে না দিলে একালের সমাজে ও রাষ্ট্রে সব জেনে বুঝেও তার চিন্তা-কর্ম-আচার আচরণে অপ্রত্যাশিত অমার্জিত অমানবিক অসংযত অশোভনরূপে প্রকটিত করবে তার প্রাণীত্ব ব্যক্তি মানুষ" (আহমদ, ১৯৯৭ : ৯)। স্বাতন্ত্র্য নয়, সহাবস্থানে আস্থা আনতে হবে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদে নির্ভর হতে হবে, বৈশ্বিক সংস্কৃতির ধারক হতে হবে, 'মানুষ' পরিচয়ই একমাত্র সত্যরূপে জানতে হবে। এই পুরাতন বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে উপর্যুক্ত বক্তৃতায়।

আহমদ শরীফ দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে স্মারক বক্তৃতার পাশাপাশি অসংখ্য ভাষণ অভিভাষণ, বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করেছেন। সমাজ সাহিত্য ধর্ম, সংস্কৃতি আর্থ-রাজনীতি প্রকৃতি ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য আলোড়িত হয়েছে। কখনো প্রধান অতিথির আসনে বসে, কখনো সভাপতির কিংবা বিশেষ অতিথির ভাষণে সমকালীন সময়ে জাগ্রত বিবেকী দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ভাষণ বক্তৃতা সমকালে কাউকে আহত করেছে, কাউকে প্রতিবাদী হতে সহযোগিতা করেছে, ভীরু-ভীতু শাস্ত্রিককে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, সরকারের আঁতে ঘা দিয়ে অনেক সময় সরকারের কোপানলে পড়তে হয়েছে। এ কারণে ১৯৯৪ সালে (বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে) বাংলা একাডেমিতে 'বাঙলাদেশের শতবর্ষের ইতিবৃত্তান্ত' নামক বক্তৃতা দেওয়ার কথা থাকলেও সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়াতে তিনি বক্তৃতা করতে পারেননি। পরে তিনি একটি বিবৃতিতে এ বিষয়ে তাঁর মর্ম বেদনা প্রকাশ করেন।[৬]

বহির্বিশ্বে ভ্রমণের প্রতি আহমদ শরীফের তেমন কোনো কৌতূহল ছিল না। তবুও প্রথমা রায় মণ্ডলের অনুরোধে জীবনের শেষ দশকে (১৯৯৩-১৯৯৪) কলকাতায় সম্মানসূচক ডিগ্রির (ডি.লিট.) অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ উপলক্ষ্যে এবং বেশ কয়েকটি সেশনে তাঁকে বক্তৃতা প্রদান করতে হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আহমদ শরীফ দেশ, জাতি, সাহিত্য, সমাজ, আর্থ-রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমৃদ্ধ চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই স্মারক বক্তৃতায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই বক্তৃতার শুরু-সারা হলেও এর মধ্যে চিন্তার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এজন্য উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন বক্তৃতায় বিভিন্ন ব্যাকরণে উপস্থাপিত হলেও চেতনাগত দিক দিয়ে রয়েছে অন্ত্যমিল। সাহিত্যকে তিনি মতবাদ প্রধান না করে মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলি সাহিত্যে আবাহন করেছেন, যেখানে মানুষ পরিচয়ই বড় থাকবে। জীবনে সমাজে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য পরিহার করার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ অনুভব করেছেন। মারা কাড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় সুস্থ-স্বস্থভাবে বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য সহাবস্থান কামনা করেছেন, এজন্য মানবিক গুণে সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার

প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছেন। বিজ্ঞানে-যুক্তিতে-মুক্তবুদ্ধিতে রেখেছেন আস্থা, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, তুক-তাক, রাশি, পাথর, অরি-মিত্র দেবতা সযত্নে পরিহারের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন। মানস মুক্তি ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য শাস্ত্র নয় বড় জোর স্রষ্টায় আস্থা রাখার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। সব কিছু মিলে আহমদ শরীফের জীবনদর্শনের একটি সমৃদ্ধ ধারা আমরা স্মারক বক্তৃতায় পেয়েছি যেখানে একজন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক, এবং সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারায় পরিপুষ্টিবান এক বৈশ্বিক নাগরিকের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার মত-মন্তব্যে কেউ আহত হতে পারেন, দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, তুমুল তর্ক করতে পারেন, কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না। একজন যুক্তিবাদী, মননশীল লেখকের কৃতিত্ব বোধকরি এখানেই।

তথ্যনির্দেশ

১. কর্নেল আবু তাহের ১৯৭৬ সালে ২১ জুলাই এক প্রহসনমূলক মামলায় ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ হারান। তাঁর স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে 'কর্ণেল তাহের স্মারক বক্তৃতা' অন্যতম। বক্তৃতার বিষয়, রাজনীতি, সমরনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অথবা সমাজ বিবর্তন ধারা ইত্যাদি। দেশ-বিদেশের যে কোনো প্রগতিশীল পণ্ডিত, গবেষক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, প্রযুক্তিবিদ কিংবা রাজনীতিজ্ঞ বা সমরবিশারদ এই বক্তৃতা দেবার জন্য বিবেচিত হবেন অন্য কেউ নন বলে বক্তৃতার নীতি নির্ধারণ কমিটির অভিমত। সূত্র : আহমদ শরীফ (১৯৮৯)। *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি*, কর্ণেল তাহের সংসদ, ঢাকা, পূর্বকথা পৃ. ১

২. কবি মতিউর রহমান-এর পরিবার তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ১৯৭৪ সালে 'কবি মতিউর রহমান ও সালেকুন্নেসা ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর কবি মতিউর রহমান স্মারক বক্তৃতা মালা, এবং একটি ছাত্রীবৃত্তিসহ 'সালেকুন্নেসা স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। কবি মতিউর রহমান (১৮৭২-১৯৩৭) ঢাকা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কর্মজীবনের (স্কুল শিক্ষক, কানুনগো) পাশাপাশি কবিতা, ছড়া, উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ কাহিনি প্রভৃতি রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁর উপর পাঁচটি স্মারক বক্তৃতামালা সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ববর্তী চারজন বক্তা ছিলেন কবি আব্দুল কাদির (১৯৭৫), প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৮০), প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৮২), প্রফেসর সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ (১৯৯১)। ১৯৯২ সালে আহমদ শরীফ ৫ম বক্তৃতা প্রদান করেন। সূত্র : আহমদ শরীফ (১৯৯২)। *সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুখবন্ধ, পৃ. ১

৩. ২৩ মে, ১৯৯৩ কলকাতার *দৈনিক গণশক্তি* এই বক্তৃতার ওপর একটি রিভিউ ছাপে — সেখানে উল্লেখ করা হয় : বাঙালি সত্তার ক্রমবিকাশের জন্য বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রগতিশীল পরিবর্তনে প্রয়োজন দুই বাংলার সম্মিলিত প্রয়াস।

৪. প্রথমা রায় মণ্ডল 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা' হিসেবে *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি* (২০০১) গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় 'বাঙলাদেশের বাঙলা সাহিত্যের বিবর্তন ধারা'র কথা উল্লেখ করলেও প্রথমা রায় মণ্ডল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আহমদ শরীফের লেখার তালিকার মূল ভল্যুয়মে 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা' হিসেবে 'বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা'র উল্লেখ করেছেন। আহমদ শরীফের *সময় সমাজ মানুষ* (১৯৯৫) এবং *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য* (২০০৪) গ্রন্থদ্বয়েও এ শেষোক্ত শিরোনামের প্রবন্ধ আছে, কিন্তু 'বাঙলাদেশে বাঙলা সাহিত্যের বিবর্তন ধারা'র উল্লেখ পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে নেই।

৫. আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম (১৩০৭-১৩৯২) বরিশালের অজপাড়া গাঁয়ে হলেও সমাজের প্রচলিত অমানবিক নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। যুক্তিবাদিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতার মুক্তি তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ। আহমদ শরীফ তাঁকে 'বাঙলার জনগণের মানসমুক্তির সহায়' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সূত্র : আহমদ শরীফ (১৯৯৫)। *সময়-সমাজ-মানুষ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১।

৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৪

গ্রন্থপঞ্জি

অমৃতলাল বালা [সংগ্রাহক ও সম্পাদক], (১৯৯৯)। *পদ্মাপুরাণ* (কবি বিজয় গুপ্ত, সংকলক বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য) বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া [সম্পাদিত], (১৯৭৪)। *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* (শুকুর মাহমুদ বিরচিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আহমদ শরীফ, (১৯৮৫)। *কালের দর্পণে স্বদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা।

—, (১৯৮৭)। *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

—, (১৯৮৯)। *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি*, কর্নেল তাহের সংসদ, ঢাকা।

—, (১৯৯০)। শিক্ষা : *সেকালে ও একালে*, প্রথম নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

—, (১৯৯২)। *সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

—, (১৯৯৪)। *প্রগতির বাধা ও পন্থা*, সন্দেশ, ঢাকা।

—, (১৯৯৫)। *সময়-সমাজ-মানুষ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা।

—, (১৯৯৭)। 'যুক্তি, জিজ্ঞাসা ও চিন্তার মুক্তি', বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, ঢাকা।

—, (২০০০)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

কাজী নূরুল ইসলাম, প্রদীপ কুমার রায় [সম্পাদিত], (২০০১)। *দেব স্মারক বক্তৃতামালা* (১৯৮১-১৯৯৯), গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পাদিত], (১৪০০)। *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* (ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত, আন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে), স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা।